॥ উৎসর্গ ॥

হিমগিরির বিচিত্র সৌন্দর্যে
যে অকথিত বাণী ও বর্ণনায় ভ'রে উঠেছিল মন
তারই যৎকিঞ্চিৎ কটি কথা
সেই আনন্দলোক পথচারীদের
হাতে সাগ্রহে অর্পিত হলো।

ওঁ

জয়তু বদ্রীনারায়ণ

তুহিন মেরু অন্তরালে
পাহাড়-ঘেরা প্রাচীরজালে
প্রাণের প্রভু করছে আমার বাস।

বিরহে তাঁর প্রাণের তারে
ব্যথা বাজে গভীর সুরে
মর্মভেদী গুমরিছে ব্যাকুল দীর্ঘশ্বাস।

কোন্ সে সুদূর শিখর-পারে
পাষাণপুরীর রুদ্ধ ঘরে
চির-তুষার রাজ্যে যেথা ঘুমিয়ে আছো তুমি,—

শক্তিহীনা আমি নারী
কেমনে গো লঙ্ঘি গিরি
বন্ধ সে দ্বার খুলব বলো আমি?

তুমি যদি লও গো ডাকি
অচিন্ পথে ভয় তবে কি?
হোক না কেন গহন পথে গভীর রাত্রিবেলা

তোমার নামটি বক্ষে ধরি
সে দুর্গমে ধরব পাড়ি
হিমসায়রে ভাসিয়ে দেব এই জীবনের ভেলা।

না যদি দাও দেখা তুমি
বন্ধ দুয়ার মোচন করি—
সেই ভাবনায় ভেবে মরে ভীরু বিকল মন !

আঁধার-কারায় বন্দী কেন
ত্রিলোকেরই বাঞ্ছিত যে ধন—
জাগো ওগো আনন্দময়, বিরাট বিশাল
বদ্রীনারায়ণ ॥

অভিযাত্রী

॥ ১ ॥

নিজের নিশ্চিন্ত নীড় ছেড়ে অজানার উদ্দেশে পাড়ি দেব কি দেব না, মনে মনে যখন চলছিল এই দোটানার দ্বন্দ্ব, এমন সময় পেলাম ভাইমন্নুর একখানা চিঠি—

"মিষ্টিদিদি !

'গণি গণি দিনক্ষণ চঞ্চল করি মন
বলো না যাই কিনা যাই রে—
সংশয় পারাবার অন্তরে হবে পার
উদ্‌বেগে তাকায়োনা বাইরে ।' "

হিমালয়ের হাতছানি বারবার উন্মনা করে দিয়েছে আমাকে, কিন্তু সে ডাকে সাড়া দেবার সুযোগ আর ঘটে ওঠে নি। নানা কাজের তাড়না কেবলই তাড়া দিয়ে নিয়ে চলেছিল।

সংসারের সহস্র কর্তব্যের চাহিদা মানুষকে অক্টোপাসের মতই নিয়ত বেষ্টন করে রাখে। তাই সে জন্ম হতে আমৃত্যু সংসারের পায়ে দাসখত লিখে দেয়, এ থেকে নিস্তার তার নেই। যদি না আত্মবলে সে বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারা যায়, তবে জালবদ্ধ মীনের মতই তাকে আর্তনাদ করতে হয় মুক্তির জন্য। একদা তাই সংসার-জ্বালা-জর্জরিত কবিকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল—

'অশ্রুজলে ভাসি মুছি এক করে
অন্য করে বোঝা তুলি মাথায়।
আমায় লোহারই বাঁধনে বেঁধেছে সংসার
দাসখৎ লিখে নিয়েছে হায়।'

আমারও এমনি খত-বাঁধা জীবনে চলছিল নানা বাধাবিপত্তি, ওজর আপত্তি। এবং সেই একটানা ঘুরপাকে অস্থির হয়ে উঠেছিল মন একটু স্থিতির জন্য—এমন সময় পেলাম ভাইমনুর দ্বিতীয় চিঠিখানা।

"দিদি! তুমি তো একঘেয়ে সংসার নিয়ে বিব্রত হয়েই আছো। একবার এই থেকে বিদায় নিয়ে হিমালয়কে ভালবাসতে শেখো। দেখবে তোমার অস্থির চিত্তে বিরাজ করবে অটল প্রশান্তি, বিক্ষিপ্ত মন হবে শান্ত। সেই মহান্ পরিবেশ জুড়িয়ে দেবে তোমার সংসারের তাপ। বিরতি ঘটবে এই বিরামবিহীন গতির। জীবনের সুদীর্ঘ কাল তো ওই আবর্তের মধ্যেই নিজেকে বন্দী করে রেখেছ; আজ একবার বেরিয়ে এসো।"

ভাইমনু গত বছর কেদার-বদ্রী ঘুরে এসেছে। সেই আনন্দলোকের অমৃতপরশ এখনো যে ওর মনকে ঘিরে আছে, চিঠির প্রতি ছত্রে সে আভাস ছড়ানো। মন উন্মনা হয়, কিন্তু পা বাড়াবার উপায় খুঁজে পায় না সে। ওর সঙ্গে তীর্থে যাবার জন্যে বলেছিল অনেক করে, কিন্তু যাওয়া আর শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে নি। কোথাও যাবার নামে নানা ভাবনা এসে ভীড় করে মনে। সারা বছরই একটা না একটা লেগেই আছে—হয় ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা, নয় অসুখবিসুখ, নয়তো অন্য কিছু। একটিমাত্র ক্ষীণজীবী বধূর উপর সংসারের দায়িত্ব দিয়ে কোথাও যেতে মন তেমন সায় দেয় না।

বছরের পর বছর ঘুরে যায়, এ সব চিরন্তন সমস্যার সমাধান আর হয় না। তা ছাড়া আত্মীয় বান্ধব যাঁরা তাঁরা কেবলই বলেন, এই বুড়ো বয়সে ওই দুর্গম পথে চলা বিপজ্জনক—এ ছাড়া একজন বাতের রোগী—শক্তসমর্থ কেউ সঙ্গে না গেলে একা এভাবে যাওয়া অসম্ভব। এসব কথা শুনে মনে কেমন একটা অজানার ভীতি এসে চেপে ধরে।

আমার নিজের শরীরও দিন দিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করছে—এটা ওটা অসুস্থতা প্রায়ই লেগে থাকে। তাই দিন দিনই শক্তিসামর্থ্য ফেলছি হারিয়ে—নানাভাবে সংসারের পাকে জড়িয়ে পড়ছি।

এদিকে উনিও ক্ষেপে উঠেছেন হিমালয় যাত্রার জন্য। হয় চল সংসারের বাধাবিপত্তি এড়িয়ে, নয় থাক তুমি তোমার সংসার নিয়ে। আমি একাই রওনা হব। সংসারের ভালমন্দ? সঙ্গীসাথী না পাই সেই দ্বিধাদ্বন্দ্ব? সে ভাবনা আর নয়। নাই বা পেলাম অন্য সঙ্গীসাথী, নিত্যকালের সঙ্গী যিনি তিনি তো আছেন সঙ্গেই, তবে আর ভয় কি?

সুতরাং মাভৈঃ বলে অলক্ষ্য সঙ্গীর চরণ স্মরণ করে রওনার জন্য প্রস্তুত হলাম আমি ও বারো বৎসরের বাতের রোগী স্বামী। আমাদের যাত্রার পূর্বক্ষণে ডাকপিওন দিয়ে গেল চিঠির মাধ্যমে ভাইমনুর স্বস্তিবাচন।

"জয় বাবা বদ্রীবিশালা।

২৮।৪।৫৬

মিষ্টিদিদি আর জামাইবাবু!

শুভ হোক আপনাদের ঈপ্সিত যাত্রাপথ। বাবা বদ্রী-বিশালার কল্যাণপরশ অনুভূত হোক প্রতি পদক্ষেপে। পরমানন্দ মাধবের সচ্চিদানন্দ রূপের প্রকাশ ভুলিয়ে দিক

আপনাদের যত গ্লানি, দুঃখ, কষ্ট, মিথ্যা ভয় ও সংশয়। বিশ্বজীবনের আনন্দতরঙ্গদোলায় যাত্রা-মুহূর্তে যারা এনেছিল অবিশ্বাসের ছোঁয়াচ, আপনাদের অটুট অচঞ্চল দৃঢ়তায় তারা হোক মূক।

'দুর্দিনের অশ্রুজলধারা মস্তকে পড়িবে ঝরি
তারি মাঝে যাব অভিসারে, জীবন সর্বস্ব ধন
অর্পিয়াছে যারে জন্ম জন্ম ধরি।'

শুভ—শুভ—শুভময় হোক আপনাদের যাত্রা। সাথী হতে পারলাম না বলে দুঃখ আমার কম নয়। ছকে-বাঁধা জীবনে আহ্বানগীত শুনতে পাই, তবুও ব্যর্থ হয় পরমের ডাক।

'হেথা আমি কেহ নহি
সহস্রের মাঝে একজন।
সদা বহি সংসারের ভার
কত অনুগ্রহ কত অবহেলা
সহি অহরহ।'

আজ থাক্ সে কথা। যাত্রাপথ হোক শুধু—

'মধুবাতা ঋতায়তে মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'

এ ধরণীর সকল কিছুই মধুময় হোক, নির্ভীক হোক তব পদক্ষেপ।

ইতি ভাইমনু"

১৮ই বৈশাখ ১৩৬৩—১লা মে ১৯৫৬।

রাত্রি সাড়ে আটটায় আমরা রওনা হলাম দুন এক্সপ্রেসে। যে তুহিনমেরু অন্তরালে ছয় মাস তুষারশয্যায় শয়ান থাকেন বদ্রীনাথজী—তাঁরই উদ্দেশ্যে।

হাওড়া স্টেশন—লোকে লোকারণ্য। বিদায় অভিনন্দন জানাতে এসেছিল বাড়ির সবাই। পুত্র, কন্যা, বধূ, ভাগ্নী, নাতিনাতিনী, ভৃত্য প্রভৃতি। নাতনী বিজয়িনী জিজ্ঞেস করে, "কোথা যাচ্ছ ঠাকুমা? কবে আসবে তোমরা?"

"ঠাকুর দেখতে যাচ্ছি ভাই। দু মাস বাদেই আবার ফিরে আসব।"

হুইস্‌ল দিয়ে গাড়ি ছাড়ল। একে একে দৃষ্টিপথের অন্তরালে চলে গেল পরিচিত মুখগুলি। মনটা কেমন করে ওঠে। গাড়ির গতি তখনো মন্থর। ক্রমে হুস্ হুস্ ঝক্ ঝক্ শব্দ বেড়ে ওঠে। প্ল্যাটফর্মে শোনা গেল কিসের যেন একটা গোলমাল। হঠাৎ আমাদের সেই চলন্ত গাড়ির কামরায় দুজন বলিষ্ঠ বয়স্ক ছেলে জনৈক যাত্রীর প্রতি ভীষণ তর্জন-গর্জন শুরু করল, "নিজে গাড়িতে চেপে বসে অন্যকে উঠতে না দেবার মানে কি? এ কম্পার্টমেণ্ট কি তোমার একার রিজার্ভ নাকি? অন্যকে ঠেলে দরজা বন্ধ করে যে দিলে, আজ যদি সে গাড়ির তলায় চাপা পড়ত তবে তার জীবনের জন্য দায়ী হত কে? ফুলিশ, আহাম্মক!" বলার সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে অপরাধীর চুল ধরে অন্য হাতে তার গালে এক প্রবল চড় কষিয়ে দিল, "চল চন্দননগর, দেখিয়ে দেব তোমার ফাজলামি।"

ছেলেটির বাবা কাছেই ছিলেন। জোড়হাতে তিনি আক্রমণকারীদের বললেন, "দেখুন, না বুঝে যে অন্যায় করে ফেলেছে তাকে ক্ষমা করুন। এই আমি ওর হয়ে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাইছি।"

ছেলেটির বয়স হবে বছর ত্রিশ বত্রিশ—গ্রাম্যযুবক। প্রতিপক্ষের উত্তেজিত উত্তর আসে, "ক্ষমা? ক্ষমা কিসের?

এ তো কচি খোকাটি নয় মশাই, বয়স্ক ছেলে! স্টেশনে পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল, তাই চলতি গাড়িতে উঠেছি—উনি ধাক্কা মেরে দিলেন দরজা বন্ধ করে! ভেবে দেখুন দিকি, আর একটু হলেই টাল সামলাতে যদি না পারতুম, কী অনর্থটাই হতে পারত?" অবশেষে সমবেত যাত্রীর অনুরোধে ওরা শান্তভাবেই নেমে গেল চন্দননগর স্টেশনে। গাড়ি তখন নৈশ অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলেছে দুরন্ত বেগে। শোনা যায় শুধু একটানা শব্দ হুঁস্-হুঁস্-হুঁশিয়ার।

নিস্তব্ধ রাত্রির বুকে ক্রমাগত দুলুনিতে ক্লান্ত দেহগুলি হুঁশিয়ারের বদলে হয়ে পড়ে বেহুঁশ। ঝুঁকতে থাকে তারা সমুখে ও পেছনে, বসে থাকার সামর্থ্য ফেলে হারিয়ে।

আধ-শোয়া-বসা করে রাতটা কেটে যায়। ভোর তখনও হয়নি। দু ধারে দিগন্তবিসারী মাঠ। নীল বনরাজি-শীর্ষে প্রভাতের পূর্বসূচনা চলছে। অস্পষ্ট ধূমায়িত আকাশ ধীরে ধীরে আলোয় ভরে ওঠে।

অধিকাংশ যাত্রী ভোরের ঠাণ্ডা বাতাসে ঘুমিয়ে আছে। আমি জেগেছি অনেকক্ষণ। জানলার পাশে বসে দেখছি নবারুণের উদয় ও শ্যাম ধরণীর অপরূপ শোভা। কোথাও তৃণাঙ্কুরিত বনভূমি, কোথাও গ্রামীণ বসতি, ঝোপঝাড়, কোথাও কৃষকের আবাদী-অনাবাদী জমি। ঠাণ্ডা মেঠো হাওয়ায় চাষীরা কাজে লেগে গেছে। মাঝে মাঝে শোনা যায় তাদের হল-চালনার বুলি—'এঁ্যঃ রি-রি-রি, এঁ্যঃ তি-তি-তি।' ভোরের পাখি উড়ে চলে ঝাঁকে ঝাঁকে। হালকা মেঘের সোপান বেয়ে সূর্যদেব দিচ্ছিলেন উঁকিঝুঁকি। সহস্রাংশুর আলোর ঝরণায় স্নাত চিত্ত আমার নিঃশব্দসঞ্চারী

হয়ে উঠল ওই নীলগগনের রঙমহলে। কী সুন্দর রূপময়ী ধরিত্রী !

রোজই এমনি সূর্যদেবের ঘটে আবির্ভাব-তিরোভাব। সপ্তাশ্বরথে রোজই তিনি পৃথিবী পরিক্রমা করেন, অফুরন্ত সৌন্দর্য যান ছড়িয়ে। কিন্তু যার কাজের চাকা সকাল থেকে সন্ধ্যা ঘুরে চলে, তার তো সে সৌন্দর্য দেখার সময় হয়ে ওঠে না। আজ মিলেছে সে অবসর, তাই শ্যাম ধরণী ও দিগন্তের অপরূপ শোভায় মন অভিভূত।

বেলা সাড়ে নটায় গাড়ি মোগলসরাই, সাড়ে এগারোটায় বেনারস ক্যাণ্টে এসে দাঁড়ায়। বৈশাখের খর রৌদ্র। দুপুরের গরম বাতাসে ওইটুকু পরিসরে ত্রাহি ত্রাহি ভাব। ধরণী যেন ধূসরবসনা যোগিনী। শুকনো ধুলোর ঝড়ে দূরের শ্যাম বনরেখা চিহ্নহীন। মানবমনের কামনা-বাসনা বুঝিবা এমনি করেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তপস্যার খাণ্ডব দাহনে।

পার হয়ে যায় জৌনপুর, আকবরপুর, অযোধ্যা, ফৈজাবাদ, বড়বাঙ্কি। সন্ধ্যায় গাড়ি এসে দাঁড়ায় উত্তর-প্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ স্টেশনে। সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শহর আলোয় আলোময়। রূপময়ী নগরী যেন অভ্যর্থনা জানাচ্ছে যাত্রীদের। ফেরিওয়ালার দল ভীড় করে গাড়ির প্রতি দরজায়। অবিশ্রাম চলে তাদের হাঁকাহাঁকি—চা চাই, চা-এ, গরম দুধ হ্যায়—গরম দুধ, পান বিড়ি চাই—এ বাবু, পান বিড়ি, লক্ষ্ণৌ কা খরমুজা বহুৎ মিট্টি হ্যায়, ইত্যাদি।

হুইস্‌ল পড়ে। যে যার দেখাশুনা, কেনাকাটা, খাওয়া-দাওয়া সেরে দৌড়য় যার-যার কামরার দিকে। আমাদের

কামরায় সবাই বসে আছে। একটি ছেলে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে। উল্টো দিকের বেঞ্চিটাতে একটি মেয়ে সটান শুয়ে আছে। ওকে বলি, "তুমি একটু সরে শোও। আমি তোমার বেঞ্চিটায় বসলে আমার জায়গায় ছেলেটি বসতে পারে। ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।"

মেয়েটি আমার কথা শুনে এমনভাবে তাকাল, যেন কোন অসঙ্গত কথা বলে ফেলেছি। কথাটা শুনে পাশ ফিরে সে যেমনটি ছিল তেমনি ভাবেই সটান শুয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পরে খক্-খক্ একটা কাশির শব্দে চেয়ে দেখি, মেয়েটি পান খেতে গিয়ে বিষম খেয়েছে। ঘটি থেকে জল খেতে গিয়ে ঘটিটাও গেল উল্টে।

এসে যায় আর একটা স্টেশন। ছেলেটি কি দরকারে নামছিল। মেয়েটি বলল, "আমাকে একটু জল এনে দেবেন ?"

"দিন"—বলে ঘটিটা হাত বাড়িয়ে নিয়ে কল থেকে জল এনে দিল ছেলেটি।

মেয়েটি তখন আমাকে বললে, "আপনি আমার বেঞ্চিতে বসে ওঁকে আপনার জায়গাটা ছেড়ে দিন না।"

একটু হেসে ছেলেটি জবাব দেয়, "আর দরকার হবে না, সামনের স্টেশনেই আমি নেমে যাব।"

চলে যায় সাজাহানপুর, বেরিলী, মোরাদাবাদ, নাজিমাবাদ। ভোর সাতটায় লাক্সা হয়ে পৌঁছই হরিদ্বার। হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। বহু লোক নামল। টাঙ্গাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা ও কুলীদের ডাকহাঁকে সরগরম হয়ে উঠল স্টেশন। যাত্রীরা চলে যায় যে-যার পথে। জনবিরল প্ল্যাটফর্ম ঝিমুতে থাকে। আমাদের চলে যাওয়ার অপেক্ষা।

দ্বিতীয় রাতটা আরামেই ঘুমিয়ে কাটল। বেলা সাড়ে আটটায় দেরাদুনে এসে গাড়ি তার ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল।

স্টেশনে উপস্থিত ছিল সুরেশ। একবার ওঁর আসাম বদলীর পথে পাণ্ডু স্টেশনে এই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় হয়। কথায় কথায় দেশের কথা, দশের কথা। নানা আলাপ আলোচনা। সেই থেকেই সুরেশ আমাকে মা বলে ডাকে। আমিও আমার ছেলেদের অন্যতমই মনে করি ওকে। এবার বদরিকাশ্রম যাবার পথে ওরই সনির্বন্ধ অনুরোধে এসেছি দেরাদুনে। ওদের বাড়ি শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে—ক্যান্টনমেণ্টে।

ট্যাক্সি নিয়ে আসে সুরেশ। কুলী মালপত্র উঠিয়ে দেয়। আমরাও উঠে বসি। পীচ-বাঁধানো প্রশস্ত সুন্দর সমতল পথ। দু ধারে বড় বড় গাছের সারি এবং অফিস, আদালত, খেলার মাঠ, সিনেমা হল, আর বিত্তবানের সৌধমালা। ফুলের বাগানে রকমারি ফুলের ঝাড়। কোথাও পথের ধারে ধারে অপর্যাপ্ত লিচুফল লালে লাল হয়ে আছে। লিচুর প্রাচুর্য দেখা যায় এই দেরাদুনে।

রাস্তার পাশেই মিলিটারি কোয়ার্টার্স। ঘরের সামনের দিকে চওড়া বারান্দা। গাড়ি এসে দাঁড়ায় বাড়ির সামনে। সুরেশের চার বছরের ছেলে বাবলু আমাদের দেখতে পেয়েই মাকে খবর দেবার জন্যে দৌড়ে গেল ঘরের মধ্যে: "মা, কে এসেছে দেখবে এস।" বৌমা স্মৃতি এসে দাঁড়ায় দু বছরের মেয়ে দীপ্তিকে নিয়ে হাসিমুখে। বাবলু এসে জড়িয়ে ধরে ওর বাবাকে। আমাদের সঙ্গে ওর এই প্রথম দেখা, সুতরাং ওর সঙ্গে একটু ভাব জমাতে সময় লাগবে বৈকি!

হাতমুখ ধুয়ে চায়ের টেবিলে চলে নানা সংবাদ

বিনিময়। দীর্ঘদিন পর দেখা, উভয়ত চলে কুশল প্রশ্নোত্তর, খুঁটিনাটি করে চলল নানা জিজ্ঞাসাবাদ। স্মৃতি নিয়ে এল প্রথমেই এক গ্লাস লেবুর সরবত। তারপর লুচি, হালুয়া, সন্দেশ, আপেল, চা। দুপুরেও ডাল-ডালনা, ভাজা-ভুজি পাঁচরকম, মাছ, চাট্‌নি, দই। বেলা তিনটেয় অরেঞ্জ স্কোয়াসের সরবত এক গ্লাস, আম এক ডিস নিয়ে স্মৃতি হাজির, "মা, এটুকু খেয়ে নিন।"

অবাক হই স্মৃতির ঘড়ির কাঁটার মত ক্লান্তিহীন কাজে। "কি গো, দুপুরে বুঝি আর একটুও বিশ্রাম নেই বাবা-মায়ের সেবায়? এই তো সবে আকণ্ঠ পুরে খাইয়েছ, এখুনি কি আবার খাওয়া যায়? ওগুলো রেখে দাও, সুরেশ এলে সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়া যাবে'খন।"

"না মা, আপনার ছেলের ফিরতে সেই সন্ধ্যে হয়ে যায়।" আপত্তি জানায় স্মৃতি।

"তা হোক, তুমি এখন ওগুলো রেখে দিয়ে বিশ্রাম করো।"

ক্ষীণকণ্ঠে আবার অনুরোধ করে সে, "তবে সরবতটা এখন খেয়ে নিন।"

"আচ্ছা বেশ, তাই দাও।"

এই বধূটির অক্লান্ত সেবাযত্নের তৎপরতা দেখে সত্যিই আশ্চর্য লাগে। নিজের হাতেই ঘরকন্নার যাবতীয় কাজ করে ও। ঝি-চাকর ছিল না তখন।

যে-ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে তার মাঝখানে ভেলভেট-মোড়া একটি টেবিল, পাশে টিপয়, দু ধারে চেয়ার। ঘরের দু দিকে দুটো স্প্রিংয়ের খাটে গদী-আঁটা ধবধবে বিছানা। দরজা-জানলায় নীল পর্দা। বিকেলে সুরেশ

মিঃ মুখার্জী নামে সহকর্মী একটি ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরল।

ওরা একটু বিশ্রাম করে নিলে সবাই মিলে বেড়াতে বেরোই। কিছু দূরে গিয়েই দেখি এক মেমসাহেবের বাগান-বাড়ি বিরাট জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে ফলের বাগান, ফুলের বাগান, মাঝখানে বাসগৃহ। প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বিঘে জমি—কত রকমের যে ফল ও ফুলের গাছ তার ইয়ত্তা নেই। মেম নিঃসন্তান। সাহেবও জীবিত নেই। একা এই বিশাল ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী মেমসাহেব। কয়েকজন মাত্র কর্মচারী ও বেয়ারা-খানসামা নিয়ে তিনি সেখানে আছেন।

সন্ধ্যার আধো-অন্ধকারে পথঘাট অস্পষ্ট হয়ে ওঠে। দূর থেকে দেখা যায় মুসৌরীর আলো। আঁধারের বুকে জ্বলছে অজস্র নক্ষত্রের মত—মিটমিট ঝিকমিক। ফেরার পথে আবার সেই মেমসাহেবের বাড়ির পথেই ফিরছি আর ভাবছি, এই তো তুনিয়ার খেলা! কোথাও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য আর কোথাও নিরন্নের আর্ত হাহাকার। কবে শোনা এক বাউলের গান মনে পড়ে যায়—

দিন যদি যায় এমন তুখে তোমায় ডাকা কেন হরি!

বাড়ি ফিরে পরদিন হরিদ্বার যাত্রার তোড়জোড় করি। ভোরের গাড়িতে আমাদের বসিয়ে দিয়ে সুরেশ চলে যায় তার অফিসের দিকে। গাড়ি চলে তার সতর্কবাণী জানিয়ে—হুঁস-হুঁস-হুঁশিয়ার!

ভোলাগিরির ধর্মশালায় উঠলাম। একটা ঘরে জিনিসপত্র বন্ধ করে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান ও মন্দিরদর্শনে চলে যাই। বাসায় ফিরলাম বেলা একটায়, কাজেই রান্না করে খাওয়ার পাট না করে সে-বেলা ফলাহারেই কাটিয়ে দিলাম।

বিকেল চারটেয় বেরুলাম ট্রেনে-পরিচিত বদ্রীনাথ যাত্রীদলের খোঁজে —শ্রবণনাথঘাটে। প্রকাণ্ড শান-বাঁধানো চত্বরের সামনেই ঘাট। একপাশে ধর্মশালা, কুম্ভকর্ণ পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওঁরা চলে গেছেন কেদারের পথে। নিরাশ হই, মনটা খারাপ লাগে সঙ্গী:' অভাবে। একসঙ্গে কয়েকজন মিলে যাওয়া, আর দুটি প্রাণী মাত্র ঐ দুর্গম পথে চলা!

ওখান থেকে চলি ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের দিকে। পথের·দু পাশে অগুন্তি দোকানপাট। খেলনা, কাপড়-চোপড়, ফলফলাদি, মিষ্টিমিঠাইয়ের সারি সারি দোকান। কোথাও চলছে কথকতা, কোথাও যৌগিক-আসন শিক্ষা, কোথাও চলছে গান। এক সুকণ্ঠীর গান ভেসে আসে—

'ধীর সমীরে যমুনাতীরে বসতি বনে বনমালী।'

ভীড় মন্দ হয় নি। বনমালীর জন্য মন ব্যাকুল না হলেও গায়িকাদর্শনের জন্য চলে ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি। ভীড়ের মধ্যে ধাক্কা খেয়ে এক বৃদ্ধা বলে ওঠেন, "আ মলো যা, চোখেও দেখতে পাও না? কেত্তন শুনবো কি, যেন রণক্ষেত্র! হুঁঃ যতো সব বেয়াক্কেলের দল!"

গঙ্গাতীরে বসেছে বিচিত্র ফুলের হাট। রঙ-বেরঙের বিচিত্র ফুল পথের দু ধারে। ফুলের নৌকো ও ঘৃতদীপ নিয়ে হাঁকাহাঁকি করছে, "লে লো মাঈ ফুল কা নাও, ঘিউকা দীয়া, গঙ্গাজীকে ভাসান লিয়ে।" চার আনায় দুটো ফুলের নৌকো ও ঘিয়ের বাতি কিনে ভাসিয়ে দিই জীবজননী জাহ্নবীর বুকে। যাত্রীদের দেওয়া অজস্র ফুল, মালা, পুষ্পতরী ঢেউয়ে দুলতে দুলতে ভেসে যায় দূর হতে দূরান্তরে।

সন্ধ্যা আসন্ন। ব্রহ্মকুণ্ডের পাড়ে মন্দিরে মন্দিরে কাঁসর-

ঘণ্টা বেজে ওঠে। যাত্রীরা প্রণাম ও প্রার্থনা জানায় দেবতার উদ্দেশে। পুল পেরিয়ে চলি হর্‌-কি-প্যরীর দিকে। বড় বড় মহাশোল মাছগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে ভেসে বেড়ায় স্রোতের মধ্যে। যাত্রীদের দেওয়া মোয়া আর আটার গুলির খোঁজে তারা ইতস্তত ঘুরে বেড়ায়। এক হিন্দুস্থানী টিপ্পনী কাটে, "ইত্‌নী বড়ী মছলী দেখ্‌ কর্‌ বঙ্গালীয়োঁকো বড়ী লোভ হোতা হৈ!" কথাটা শুনে ভাল লাগল না। যদিও বাঙালী মৎস্যপ্রিয় জাতি, তা বলে তীর্থে এসে জলের মধ্যে জ্যান্ত মাছ দেখে জিভে জল ঝরবে, এ কেমন কথা? কাশীতে দেখেছি, মৎস্য-নির্লিপ্ত বহু হিন্দুস্থানী এখন নির্বিবাদে মাছ খায়, তারিফও করে। তাই এ মন্তব্যের প্রতিবাদ করি, "ইস্‌ মামলেঁ মে হিন্দুস্থানী ভী কম লোভী নহিঁ। বনারস মে বহুৎ সে হিন্দুস্থানীয়োঁকো মছলী খাতে দেখা, ঔর ওয়ে উস্‌কী বড়ী তারিফ করতে হ্যাঁয়।" বলতে বলতে চলে যাই পুল পেরিয়ে। অকারণ বচসার সৃষ্টি করে লাভ নেই।

এবার দেখলাম গঙ্গার এপার থেকে ওপারে যাবার একটি পুল তৈরি হয়েছে, বেশ চওড়া ও সুন্দর। গতবার যখন এসেছিলাম, তখন এটি ছিল না। এতে লোকের সুবিধে হয়েছে খুব। এমন একটি পুলের খুবই দরকার ছিল। পুলের মাঝামাঝি জায়গায় দু ধারে মকর, মধ্যে ঐরাবত। ঐরাবতের মুখ থেকে ফোয়ারার মত বেরুচ্ছে গঙ্গাজল। গঙ্গার এ পারে মুখর নগরী, ওপার শান্ত নিরিবিলি। আমরা সেদিন ওপার থেকে ফিরছি, এমন সময় অন্য একটি দলের সঙ্গে মুখোমুখি হতেই একটি মেয়েকে ভারি চেনা চেনা ঠেকল। মেয়েটিও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। অথচ একে যে কোথায় দেখেছি, কিছুতেই মনে আর করতে

পারছি না। মনে মনে একটা অস্বস্তি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মেয়েটির কথায় চমক ভাঙে। হেসে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করছে, "আমাকে চিনতে পারলেন না বুঝি ?" মহা অপ্রস্তুত ! সত্যিই তখনও মনে আনতে পারছি না কে এই মেয়েটি। মেয়েটি আমার অবস্থা বুঝে আরও কাছে এসে আমার হাত ধরে বলল, "আপনি কমলের মা না ?"

সহসা সেই সুরে বিস্মৃতি কাটে, নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, "আরে রমা ! তারপর, ভাল তো সব ? এখন আছ কোথায় ? বিজয়ের খবর কি ? ব্যাঙ্গালোরেই আছে ?" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলি।

"আমরা তো প্রায় দু বছর হল দেরাদুনেই আছি। বিজয় ট্রেনিং শেষ করে এখন এখানেই আছে। আপনি বুঝি প্রথমে আমায় চিনতে পারেন নি ? চলে যাচ্ছেন দেখে আমিই এলাম।" জবাব দেয় রমা।

"আর বলো কেন, মনে যে কি ভুলই এসে বাসা বেঁধেছে, কোন্‌দিন হয়তো নিজের পরিচয়ই ভুলে বসে থাকব। এজন্য সময় সময় ভারি মুশকিলে পড়তে হয়। এই তো দেখ না সেদিন এক ঠাকুরবাড়ি গেছি, মন্দিরে প্রণাম করে ফিরছি, এমন সময় একটি মেয়ে আমায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি ভারতীর মা না ?' আমি চিনতে পারি না। মেয়েটি তখন বললে, 'বাণীর কথা আপনার মনে নেই ?' অথচ এই বাণীকে দেখেছি কতবার। বাড়িতেও এসেছে, তবু সেই ভুল। কথা বলতে গিয়ে আজকাল খেই হারিয়ে ফেলি। কি যে বিপদ হয়েছে।"

"তা বয়েসের সঙ্গে সঙ্গে ভুলভ্রান্তি একটু বাড়ে বৈকি ! তা ছাড়া আপনার স্বাস্থ্যও বড় ভেঙে গেছে দেখছি, হঠাৎ

দেখলে চেনা যায় না। মিঃ গুপ্তকে দেখে বুঝতে পেরেছি আপনি কমলের মা। এখানে কোথায় উঠেছেন? কদিন থাকবেন?" জিজ্ঞাসা করে রমা।

"উঠেছি ভোলাগিরির ধর্মশালায়। বহুদিনের নীরোগ দেহ এখন ব্যাধির মন্দিরে পরিণত হয়েছে। দিন যায় কাজ বাড়ে, অবসর মেলে না। ক্রমেই দেহ জীর্ণ হয়ে আসছে। তাই এবার বদ্রীনাথের নামে বেরিয়েছি—বহুদিনের ইচ্ছা যদি পূর্ণ করেন ঠাকুর! তোমরাও ওদিকে যাবে নাকি?"

"নাঃ, আমাদের কেদার-বদ্রী বেড়ানো এখন শিকেয় তুলে রেখেছি। সংসারের যে-জালে জড়িয়েছি, এ ছেড়ে পাদমেকং ন গচ্ছামির অবস্থা আর কি। এই তো ভাশুরঝি এসেছে নাগপুর থেকে হরিদ্বার দেখবে বলে। দু ঘণ্টার পথ, তাই ওর সঙ্গে বেড়াতে আসা। আর মুসৌরী ঘরের কোণে, বড় জোর সেখানটা দেখে আসব ভাবছি। ঝাড়া হাত পা না হলে আর তীর্থধর্ম! আপনারা কবে যাচ্ছেন? ঘুরে এসে নিশ্চয়ই আমাদের বাড়ি যাবেন কিন্তু।" সনির্বন্ধ অনুরোধ জানায় রমা।

"নিশ্চয়ই, ফিরে এসে তোমাদের ওখানে যাব বৈকি? আমাদের তো দেরাদুনেরই থ্রু টিকেট।"

"দেখবেন, আবার ভুলে যাবেন না যেন!" বলে রমা।

"না গো না, ভুলব না, ঠিকই যাব। দেখবে একদিন হঠাৎ গিয়ে হাজির।" হেসে দুজনেই চলার পথে পা বাড়াই।

রমা এক অফিসারের স্ত্রী। বয়েসে আমার অনেক ছোট, সুন্দরী মিষ্টভাষিণী। রমার সঙ্গে পরিচয় ঘটে আসামের এক শহরে। ওর বড় ছেলে আমার এক ছেলের সতীর্থ। সেই সূত্রে ঘটে দুই পরিবারের মধ্যে পরিচয় ও হৃদ্যতা।

কিছুদিন পর ওরা চলে যায় শিলং। আমরা চলে আসি কলকাতা। বহুদিন পর আবার এই হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটে দেখা।

কবে বিশ্বকবি গেয়েছিলেন অবগুণ্ঠন-উন্মুক্তির গান, সেই বাণী বর্তমানযুগের প্রগতিবাদিনীরা প্রতিপালনে বদ্ধপরিকর। অবগুণ্ঠন তাই অবলুপ্ত। আর সিন্দূরবিন্দু সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে হয় নিশ্চিহ্ন, নয় কুঙ্কুমটিপে পরিণত। সুতরাং দূর থেকে এ যুগের মেয়ে না বধূ চেনা দায়। রমার বেলায় ছিল আমার সেই বিভ্রান্তি ও বিস্মৃতি দুইই।

॥ ২ ॥

ভোলাগিরির দুটো ধর্মশালা। একটা গঙ্গার তীরে, আর একটা পথের অপরদিকে। ভোলাগিরির যে-ধর্মশালায় আমরা উঠেছি সেটি চকমিলান দ্বিতল দালান। ছাদের ওপর থেকে দেখা যায় বহুদূরব্যাপী গঙ্গার দৃশ্য। ধবলতরঙ্গিণী গঙ্গা ছুটে চলেছে আপন মনে। শোনা যায় তার কলকল ছলছল শব্দ। দোতলার চতুর্দিকের প্রাকারে খোদিত শ্রীশ্রী ভোলানন্দজীর উপদেশাবলী। যথা, 'প্রত্যহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার জন্য ভূমিকে, পবিত্রতা ও সরলতার জন্য জলকে, হৃদয়ে প্রকাশশক্তির জন্য সূর্যনারায়ণকে, ভগবদ্ভক্তিলাভের জন্য পিতামাতা ও গুরুজনদিগকে শ্রদ্ধাভরে প্রণাম করিবে।'

এই উপদেশাবলী যাত্রীদের মনে আধ্যাত্মিক প্রেরণা জোগায়। ধর্মশালার ঘরে ঘরে বহুযাত্রীর ভীড়। কেদার বদ্রীর যাত্রীই বেশী। তা ছাড়া হৃষীকেশ, লছমনঝোলা,

মৌনী কি রেতি তপোবন, সপ্তঋষি, ভীমগোড়া প্রভৃতির দর্শনার্থী এবং মুসৌরী দেরাদুনের যাত্রীও রয়েছে।

এখানের যিনি ম্যানেজার তিনি অতি অমায়িক লোক, শান্ত সৌম্যদর্শন। কথা বলেন হাসিমুখে ধীরে ধীরে। যদিও গাড়োয়াল এঁর জন্মস্থান, কিন্তু লেখাপড়া শিখেছেন বাংলা-দেশে থেকে, তাই কথা বলতে পারেন পরিষ্কার বাংলায়। ধর্মশালায় এঁকে সবাই পণ্ডিতজী বলে ডাকে। শেষরাত্রি চারটে থেকে ভোর ছটা এবং সন্ধ্যে ছটা থেকে সাড়ে সাতটা অবধি ইনি নিয়মিত ধ্যান করেন। পণ্ডিতজীর সেই শান্তস্নিগ্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন যোগমগ্ন মহেশ্বর। শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে। কথায়বার্তায় সব মিলিয়ে একটা সাত্ত্বিকতার ভাব। ধর্মশালা থেকে বেরুবার পাশের এক ঘরে উনি থাকেন। অন্য পাশের ঘরে থাকে চৌকিদার রামলাল। সবাইকেই ডেকে ডেকে উনি খোঁজখবর নেন—জিজ্ঞেস করেন সুবিধা-অসুবিধার কথা।

ধর্মশালায় প্রতিদিন আসে পাণ্ডা চন্দ্রাপ্রসাদ ও সূর্য-প্রসাদের ছড়িদাররা। ঘরে ঘরে জিজ্ঞেস করে, "আপ্ কঁহাপর যায়েঙ্গে বাবুজী। আপ্ কিধার যায়েঙ্গে মাতাজী? আভী তো কেদার-বদ্রী যানে কো রাস্তা বহুৎ সুবিস্তা হো গিয়া। চলিয়ে হামারা সাথ, বহুৎ আরামসে লে যায়েঙ্গে"—ইত্যাদি বাঁধা গৎ বলে যায়। আমরা একটি ভাল দলের অপেক্ষায় ছিলাম, তাই কাউকেই পাকা কথা দেওয়া হয় না।

দেরাদুন থেকেই শরীরটা আমার একটু খারাপ হয়েছিল। মনটা ধুকধুক করে, কি জানি অসুস্থতার জন্য যদি বদ্রীনাথধাম দর্শন না হয়! পণ্ডিতজীকে বলেছিলাম, "উনি বাতের রোগী। তার মধ্যে নিজেও আজ দুদিন থেকে অসুস্থবোধ

করছি, এতদূর এসে যদি যাওয়া পণ্ড হয় তা হলে আর আপসোসের অন্ত থাকবে না। আপনি দেখবেন বাবা, বহু যাত্রী তো আসছে যাচ্ছে। বদ্রীনাথ যাবার কোনও যাত্রী মেলে কিনা।"

তিনি বলেছিলেন, "ভয় কি মা, এ অসুস্থতা সেরে যাবে। ভগবানে বিশ্বাস হারিয়ো না, তিনিই নিয়ে যাবেন পথ দেখিয়ে। সঙ্গীর অভাব কি?"

সেদিন গঙ্গায় নাইতে যাচ্ছি। দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছ মা?"

"আজ একটু ভাল আছি বাবা। আপনি যেন ভুলবেন না ভাল সঙ্গীর কথা।"

আমার কথা শুনে প্রাণখোলা হাসি হেসে বলেন পণ্ডিতজী, "আবার সেই সঙ্গীর ভরসা? জগতে কে কার সঙ্গী মা? বদ্রীনাথের ওই একই পথ। তোমরা দুজনেও বদ্রীবিশালার নামে বেরিয়ে পড়। ভাবনা নেই, তিনিই পথ দেখিয়ে নেবেন। তিনি যে মা নিত্যকালের সঙ্গী। কারু ভরসায় থেকো না মা।"

পরদিন বিকেলে উঠোন থেকে পণ্ডিতজী ডাকলেন, "ঘরে আছ মা?" ঘরে ছিলাম দুজনেই। গঙ্গার ধারে বেড়াবার প্রস্তুতি চলছিল। পণ্ডিতজীর ডাকে সাড়া দিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়াই। উনি পণ্ডিতজীকে ঘরে এসে বসতে অনুরোধ করলে পণ্ডিতজী বললেন, "বাইরেই বেশ আছি, ঘরে বড় গরম। এখন বেরুব ভাবছিলাম, এর মধ্যে বদ্রীনাথ-যাত্রী একদল পাওয়া গেল। তাই আপনাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে এলাম। এঁরা চন্দননগর থেকে এসেছেন।" বলে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ওঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

পরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "এই নাও মা তোমার বদ্রীনাথ-যাত্রী। এঁরা শুধু বদ্রীনাথই যাবেন।" পরিচয় করিয়ে দিয়ে তিনি চলে যান সান্ধ্যভ্রমণে।

প্রৌঢ় স্বামী, স্ত্রী ও তরুণ পুত্র। আলাপ চলে কলকাতা-চন্দননগরের। যাবার সময় মহিলা আমায় বারবার মিনতি করে বললেন, "দেখবেন, আমাদের যেন ফেলে যাবেন না।"

অবাক হয়ে জবাব দিই, "ফেলে যাব, সে কি কথা! আমরা যে আজ কদিন ধরে ভাবছি—হয়তো শুধু বদ্রীনাথ-যাত্রীই পেয়ে যাব। আপনাদের পেয়ে খুব ভাল হল। আমরাও শুধু বদ্রীনাথই যাব। ওই অজানা পথে মানুষ দল বেঁধেই বেরোয়। আমরা তো বদ্রীনাথের নাম নিয়ে শুধু দুজনেই বেরিয়েছি।"

পরদিন সকালে উঠে দেখি ওঁরা ভোরের গাড়িতে বদ্রীনাথের পথে চলে গেছেন। এত অনুনয়-বিনয়ের পর ওঁদের এই নিঃশব্দ প্রস্থানে বিস্ময়ের সীমা রইল না। বিচিত্র মানুষের মন ও আচরণ—তার অন্ত পাওয়া ভার।

ধর্মশালার সামনেই গঙ্গা। ঘাটের এক পাশে শিবের মন্দির। মন্দিরের মাঝখানে শিবলিঙ্গ, দেয়ালের গায়ে পার্বতী ও গণেশের মূর্তি। সন্ধ্যায় প্রায়ই এসে বসি, কখনো মন্দিরে কখনো ঘাটে। কী যে ভাল লাগে গঙ্গার কুলুকুলু কলকল গান! যেন অনাদিকালের সঙ্গীত নৃত্যচ্ছন্দে গেয়ে চলেছে সুরধুনী। আবছা আঁধারে নীরবে বসে থাকি।

সেদিনও গঙ্গাতীরে বসে আছি। এক প্রবীণা ভদ্রমহিলা ঘাটে বসে আহ্নিক করছিলেন। জপ শেষ হলে তিনি আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কোথাকার যাত্রী?"

উনি উত্তর দিলেন, "আমাদের বদ্রীনাথ যাবার ইচ্ছে।"

"তা বেশ। শুধু বদ্রীনাথই যাবেন—কেদারনাথ নয় ?"

উনি বলেন, "ইচ্ছে তো ছিল দু জায়গায় যাবার, কিন্তু হয়ে উঠবে বলে মনে হয় না। কারণ আমি নিজে বাতের রোগী, আমার স্ত্রীও কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এখানে এসে। ভাল কোন সঙ্গীসাথীও পাচ্ছি নে। পথও খুব দুর্গম শুনছি, ভাবছি কী করি।"

প্রবীণা বললেন, "বেশ তো, এই দেখুন না আমিও বদ্রীনাথ-যাত্রীই খুঁজছিলাম। আপনারা যখন শুধু বদ্রীনাথই যাবেন, আমি আপনাদের সঙ্গী হতে পারি। যদি কেউ শুধু বদ্রীনাথ যায়, আর একবার ঘুরে আসব ভাবছি।"

আমি জিজ্ঞেস করি, "আপনি বুঝি আগে একবার গিয়েছিলেন ?"

তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ মা, আরও দুবার কেদার-বদ্রী ঘুরে এসেছি। আর এখন দু জায়গায় যাবার শক্তি নেই।"

আমি বললাম, "আমাদের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। কারণ ওঁরও শরীর ভাল নয়, আমিও কদিন ধরে বেশ একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছি। তাই ভেবেছি অন্ততঃ এক জায়গাই ঘুরে আসা যাক।"

তিনি উত্তর দিলেন, "ভাবনা কিছু করো না মা, কত লোক যাচ্ছে। বদ্রীনাথের এমনি মাহাত্ম্য, যে তাঁর নামে বেরোয় তিনিই তাকে টেনে নেন। আমি তো আরও দুবার গেছি।"

বলে তিনি পথের যে বর্ণনা দিলেন, মনের ভীতি অনেকটা তাতে হালকা হয়ে গেল।

বললাম, "আপনি যদি যান মা, তবে বেশ হয়।"

মা বললেন, "কবে নাগাদ যেতে চান আপনারা ?"

আমি বলি, “যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।”

উনি বললেন, “আগামীকাল কি পরশুই রওনা হতে চাই।”

মা বললেন, “যেতে তো আমি প্রস্তুত, কিন্তু কাল-পরশু তো হবে না। কারণ ভোলাগিরি মহারাজের তিরোভাব-তিথি উৎসব আগামী পরশুদিন। দেশ-বিদেশ থেকে বহুলোক আসবে এই উৎসবে। মোহান্ত মহারাজও আমাকে ঐ সময় থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন। আপনারাও বরং উৎসবটা দেখে যান। তার পরদিন যাবার আর কোন অসুবিধে হবে না।”

অবশেষে উনি আর মা দুজনে মিলে ঠিক করলেন, উৎসব-শেষে ঐদিন বিকেলের বাসে হৃষীকেশ রওনা হওয়া যাবে। বুড়ো মায়ের বয়েস চৌষট্টি বছর, কিন্তু চেহারাখানা বেশ শক্ত-সমর্থ। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা প্রভৃতি নানা জায়গায় ইনি ঘুরেছেন। কথায়বার্তায়ও দেশ-ভ্রমণের একটা সতেজ সাবলীল গতি আছে।

মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বেজে ওঠে ঢং ঢং করে। ‘ওঁ নমো শিবায়, ওঁ নমো শিবায়’—মহাদেবকে আরতি করছেন পণ্ডিতজী। বন্দী মানবাত্মার কণ্ঠনিঃসৃত সে গভীর মন্ত্রধ্বনি লুটিয়ে পড়ে মুক্ত আনন্দে বিশ্বদেবতার চরণতলে। আরতি শেষে প্রণাম—

বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারকায়
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময় সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায়
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥

॥ ৩ ॥

পরদিন গঙ্গায় নাইতে গেছি। ঘাটের সিঁড়িতে বসে আট-ন বছরের একটি ফুটফুটে পাঞ্জাবী ছেলে। গঙ্গার জলে পা ডুবিয়ে মহা আনন্দে 'হরি ওঁ হরি ওঁ' বলে মাথায় অঞ্জলি ভরে জল দিচ্ছে। ছেলেটির বাবা মা ঘাটের উপরের সিঁড়িতে বসে গল্প করছিল। আমি স্নান সেরে ঐ শিশুর প্রাণখোলা নামগান শুনতে শুনতে ঘরে ফিরছি আর ভাবছি, কে দিয়েছে এই শিশুর মনে এই প্রেরণা? কে শিখিয়েছে ওকে এই প্রাণভরা ডাক? কী যে মিষ্টি শিশুর মুখে হরিনাম!

পথে চলতে চলতে মনে হয়, গঙ্গার যে তীব্র স্রোত! ছেলেটি তো আনন্দে আত্মহারা, যদি অসতর্ক মুহূর্তে স্রোতে ওকে টেনে নিয়ে যায়! ওরা হয়তো নতুন এসেছে, ওর মাকে সাবধান করে দিলে ভাল হত। আসন্ন বিপদ কল্পনা করে সারা শরীর ঝংকার দিয়ে ওঠে। চোখ বুজে ভাবি, ওকে রক্ষা কর দয়াময়। কেন মনে আসে যত অলীক ভাবনা?

বিকেলে ওয়াটার-ব্যাগে জল ভরবার জন্য কলতলায় গেছি। জনৈকা ধর্মশালাবাসিনী বলে উঠলেন, "শুনেছেন দিদি, দুপুরে আট-ন বছরের একটি পাঞ্জাবী ছেলে যে ঐ ধর্মশালার ঘাট থেকে ভেসে গিয়েছিল, ওর মা-বাবার চিৎকারে লোকজন এসে পড়ায় গীতাভবনের ঘাটের কাছে কী ভাগ্যে ছেলেটিকে পেয়ে যায়! ধন্যি বাবা! যে স্রোত— শিকলি ধরে আমরাই নাইতে ভয়ে মরি, বুঝি তলিয়ে যাই, আর ওইতো কচি শিশু! জোর বরাত ওর বাপ মায়ের যে ছেলেকে খুঁজে পেয়েছে।"

কথা শুনে আনন্দ ও বিস্ময়ে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। অন্তর্যামী শুনেছেন অন্তরের নিবেদন। যাঁর পরিপ্রেক্ষিতে

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সতত পরিদৃশ্যমান, শরণাগতের রক্ষার জন্য তিনি যে সদাই হাত বাড়িয়ে আছেন। নইলে ঐ দুরন্ত স্রোতের কবল থেকে শিশুকে বাঁচানো যে অসম্ভব ছিল।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

'ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥'

'হে কৌন্তেয়, যে অনন্যমনে আমার স্মরণ করে, মদ্গতপ্রাণ আমার সেই ভক্তগণ কখনো বিনষ্ট হয় না।'

কী সুন্দর প্রাণস্পর্শী অভয়বাণী!

তবু কি প্রাণভরে কখনো ডাকি সেই প্রেমময়কে?

যেমন করে মীরাবাঈ চেয়েছিলেন গিরিধারীলালকে—'মেরে জীবন মরণ সাথী তোঁহে না বিসরি দিনরাতি।' আছে কি আত্মসমর্পণের আকুল আকূতি মনে? মায়ার আবরণে আমরা নিয়তই বিস্মৃত হই সেই অন্তরতমকে। যে সত্যিকার আমার তাঁকে ভুলে গিয়ে ক্ষণিকের 'আমি ও আমার' নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। তাই দুদিনের জন্য যাকে পাই তাকে হারাই আর কাঁদি। এই পার্থিব জগতের স্বার্থদ্বন্দ্বে ব্যস্ত হয়েই তো আমাদের অপার্থিব বস্তুর সাধনা বা ভাবনার অবসর নেই। যথার্থ 'আমি'র সন্ধান করব কখন?

হ্যাঁ, সন্ধান করি তখনই যখন কোন ঘনীভূত বিপদের সম্মুখীন হই। যখন মৃত্যুর করাল ছায়া দেখতে পাই, যখন আধিব্যাধিভারে জর্জরিত হই তখনই আর্ত মনে বলি, 'রক্ষা করো ভগবান, দয়া করো দয়াময়।' অর্থ যশ মান সুখ সৌভাগ্যের আশাতেই ধরনা দিই দেবালয়ে। সাড়ম্বরে পূজা-পার্বণ করি দেবদেবীর। চণ্ডীর স্তুতিতে উন্মুখর স্বার্থান্বেষী মনের আবেদন—রূপং দেহি, যশো দেহি, ভাগ্যং ভগবতি

দেহি মে। ভক্ত কবির সুরে সুর মিলিয়ে পারি কি সমগ্র অন্তর দিয়ে বলতে—

'নয়ন মুদিলে দেখা যদি মিলে, আমায় অন্ধ করিয়া দাও গো
দারা সুত দিলে যদি প্রেম মিলে কেড়ে নাও কেড়ে নাও গো।
চাহি না ধনমান মনোমোহন
চাহি না গরবিত রূপযৌবন
যাহা পেলে হায় হৃদি ভরে যায় কণিকাটি তারই দাও গো॥'

পারি না তো এই আত্মসমর্পণের মন্ত্রে নিজেকে উদ্বোধিত করতে! বরং যতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম আদায় করা যায় ভগবানের কাছ থেকে, মন ফেরে তারই ফিকিরে। মনের এই চঞ্চলতায় অতিষ্ঠ হয়েই কুমার সুধাকর বলেছিলেন—

"মনরে সোনা মানিক ধন, চুপ করো আজ ধ্যানে বসি
কাল তোমারে করবো রাজা, এনে দেবো রাজমহিষী।'

'রাজমহিষী' অর্থাৎ কুলকুণ্ডলিনী। সাধন-স্বর্ণকাঠির ছোঁয়ায় যেদিন সে জেগে উঠবে মানুষের মনে সুপ্তিলোকের শয্যা ছেড়ে, সেদিনই মন তার লাভ করবে রাজত্ব ও রাজকন্যা। তখন বিশ্বপ্রকৃতির বশীভূত সে আর নয়, প্রকৃতিই তার বশীভূতা। গভীর দুঃখনিশায় দেখতে পায় সে ভগবানের কল্যাণময় রূপ। মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও দেখতে পায় সে অমৃতলোকের আলোকদ্যুতি! মরণের ওপারে দেখে মহাজীবনের নবীন তোরণ!

কিন্তু মানবাত্মা অনন্ত কামনাশৃঙ্খলে আবদ্ধ। অলখের বাঁশীর ডাকে সেই বন্দী আত্মা যখন ছায়ালোকের প্রত্যন্তে এসে দাঁড়ায়, তখনো সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সেই অনন্ত মায়াধরের গোলকধাঁধায় অন্ধের মতই পথ হাতড়ায়। তাই শক্তি-উপাসক কমলাকান্ত গেয়েছেন—

'কখনো পুরুষ কখনো প্রকৃতি
কখনো শূন্য-রূপারে।
আমি বুঝিতে পারি না জননী কেমন
ভাবিতে জনম গেলরে ॥'

এই মায়া টুটে তাঁরই কাছে যিনি দেখতে পান প্রলয় আঁধারে শিবসুন্দরের নৃত্য। তিনিই বুঝতে পারেন সমস্ত দ্বন্দ্বের অন্তরালে দাঁড়িয়ে রয়েছেন মা ব্রহ্মময়ী।

গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥'

ব্রহ্মাশ্রিত এই দৈবী মায়া থেকে মুক্তির উপায় ভগবৎচরণে একান্তভাবে শরণাগতি। মনের সবকিছু আকাঙ্ক্ষা নিঃশেষে সঁপে দিতে পারলেই মানবাত্মার ঘটে মোহমুক্তি।

॥ ৪ ॥

সন্ধ্যায় সবে বেড়িয়ে ফিরছি। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে শোনা গেল ভৈরবীর গলার গর্জন, "না—না—না, এ ঘরে থাকার জায়গা-টায়গা হবে না বলছি।"

প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আসে মিনতির সুর : "আমি একা মানুষ মা, এই তোমার ঘরের কোণটিতে আজ রাতটার মত একটু পড়ে থাকতে দাও না। কালই দুপুরের গাড়িতে বৃন্দাবন চলে যাব। দুদিন বাসের ঝাঁকুনিতে বড় কাহিল হয়ে পড়েছি।"

এত অনুরোধেও মায়ের মন টলল না। তেমনি চড়া গলায় বললেন, "বলেইছি তো এ ঘরে থাকা-টাকা হবে না— তা একাই হও আর দোকাই হও। অন্য ঘরে পথ দেখ।"

"অন্য ঘর তো খালি নেই মা।"

"খালি নেই তার আমি কি জানি। যাও না ম্যানেজারের কাছে।" বলতে বলতে খটাখট খটাখট শব্দে খড়ম চালিয়ে ভৈরবী চলে গেলেন কলের দিকে।

আমরা ততক্ষণে আমাদের ঘরের সামনে এসে গেছি। উনি তালা খুলে ঘরে ঢুকলেন। আমি হাত-পা ধুতে কলতলার দিকে যাচ্ছি। যেতে যেতে দেখলাম, বারান্দার একপাশে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে ক্লান্ত অসহায়ভাবে বসে একটি বৈষ্ণবী।

বুঝলাম এরই সঙ্গে ভৈরবীর চলছিল কথা কাটাকাটি। বৈষ্ণবীর বয়েস হবে বছর পঁয়ত্রিশ। শান্ত নম্র মুখখানা। দেখলে মায়া হয়।

'কলতলা থেকে ফেরার পথে জিজ্ঞেস করি, "কোথা থেকে এলে বাছা? যাবেই বা কোথায়?"

সখেদে বৈষ্ণবী উত্তর দেয়, "আর মা যাওয়া! বেরিয়েছিলাম বৃন্দাবন থেকে বদ্রীনাথদর্শনের জন্য। সাধ ছিল বহুদিনের। সঙ্গীও পেয়ে গেলাম একদল। কিন্তু মা, কপালে লেখা না থাকলে দেখা তো তার হয় না। তাই ফিরে এলাম দেবপ্রয়াগ পর্যন্ত গিয়ে।"

জিজ্ঞেস করি, "এতটা পথ গিয়ে ফিরলে, শরীর বুঝি খারাপ হয়ে পড়েছিল?"

"হ্যাঁ মা, একে এতটা পথ বাসের ঝাঁকুনি, তায় সেদিনটা ছিল একাদশী, শরীরটা পড়লো অসুস্থ হয়ে। সঙ্গী যারা ছিল তারা বললে এ শরীরে তোমার যাওয়া চলবে না। তুমি ফিরে চলে যাও। আমায় ফেলে ওরা চলে গেল।"

"আহা! ভারি দুঃখের কথা তো। এত আশা করে তোমার যাওয়া হল না! ওরা তো দুদিন অপেক্ষা করেও যেতে

পারত। দুদিন বিশ্রামে তুমিও সেরে উঠতে। আজকাল মানুষের দয়ামায়ার বড় অভাব।”

“যা বলেছ মা। আজকাল মানুষ বেশীর ভাগই দয়ামায়া-শূন্য। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। পরের কথা ভাববে কখন? এই তো ভৈরবীর ঘরে জায়গা রয়েছে অথচ আমায় থাকতে একটু জায়গা দিলে না। ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন এই ঘরেই থাকতে, কিন্তু ভৈরবী মায়ের তা ইচ্ছে নয়। ভেবেছি বাইরে বসেই রাতটা কাটিয়ে দেব। ঝামেলা আমার ভাল লাগে না।”

বৈষ্ণবীর কথা শুনে দুঃখ হয়। আগে মানুষের মনে ছিল কর্তব্য ও মমত্ববোধ, ছিল অতিথিপরায়ণতা। এখন তার বদলে নিজেকে নিয়েই মানুষ ব্যস্ত, চলে স্বার্থদ্বন্দ্বের হানাহানি। নেই আগেকার সেই সদ্ভাব-সম্প্রীতি।

কিন্তু এই ভৈরবী ধর্মপথচারিণী হয়েও কেন তাঁর এই নির্মম মনোভাব? ধর্ম কি বাহ্যিক আড়ম্বরে, না, কায়মনো-বাক্যে? বৈষ্ণবীর এত কাতর অনুনয়েও কেন মন টলল না এই শৈবসন্ন্যাসিনীর? বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত বলেই কি এই বিরোধ? ধর্মকে ভিত্তি করে যাদের জীবন গড়ে উঠেছে, তাদের মধ্যেও বিবাদ-বিভেদের এ দ্বন্দ্ব কেন? হরি ও হর যে একাত্ম, অভেদ। কী তবে এদের সাধনরীতি?

যা হোক, আপাততঃ সে জ্ঞানবিচার স্থগিত রেখে ক্ষুৎপিপাসাক্লান্ত বৈষ্ণবীকে বলি, “তুমি চল আমাদেরই ঘরের একপাশে থাকবে ’খন।”

সলজ্জভাবে জিভ কেটে বৈষ্ণবী বলে, “সে কি হয় মা? বাবু যে রয়েছেন, কি ভাববেন। ঘরে আমার দরকার নেই, আমার এ দুটো জিনিস যদি আপনার ঘরে রেখে দেন

তবে বড় ভাল হয়।” বলে একখণ্ড নেকড়া-বাঁধা কিছু টাকা আমার হাতে দিল, আর একটি পুঁটলিতে কিছু জিনিস ঘরের কোণে রেখে দিয়ে গেল।

বৈষ্ণবী বাইরে যাচ্ছিল, ডেকে বলি, “তোমার নামটি জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। নাম কি তোমার ?”

“আমার নাম জ্ঞানদাসী মা।”

খটাখট খটাখট খড়মের আওয়াজ শোনা যায়—ভৈরবী আসছেন। আমাদের ঘরের দুটো ঘর পরে ওঁর ঘর। আমাদের দিকে ভাঁটার মত চোখে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হেনে ঘরে ঢুকলেন তন্ত্রসাধিকা।

চৌকিদার রামলাল এসে ডাকে, “চুল্লা মে আগ্ লাগা দিয়া মাঈজী।”

বললাম, “আচ্ছা, তুম যাও, ম্যায় যাতী হুঁ।”

রামলাল জ্বলন্ত উনুনটা ঘরের কোণে রেখে দিয়ে চলে যায়। রাত্রির রান্না চাপিয়ে দিই। রান্না হল খিচুড়ি ও ভাজা।

উনি খেয়ে নিলেন। জ্ঞানদাসীকে বলি, “চল, এবারে তুমিও খেয়ে নেবে।”

“না মা, রাত্তিরে তো আমি অন্ন খাই না।”

“তাই নাকি ! আমি যে তোমার জন্য রান্না করেছি গো। তবে কি খাবে এখন ?”

“আমার রাত্রির মত ছাতু-গুড় সঙ্গেই আছে। আমার জন্য ভাববেন না। আপনি খেয়ে নিন মা।”

বেড়িয়ে ফেরার পথে কয়েকটা আম কলা ও কমলা কিনে এনেছিলাম। তাই থেকে কিছু ফল ও দুধ জ্ঞানদাসীকে দিয়ে আসি।

খেতে বসেছি। খুট্‌ করে দরজার কড়াটা নড়ে ওঠে। চেয়ে দেখি জ্ঞানদাসী দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করি, "কি গো, কিছু চাই নাকি ?"

"কিছু নয় মা। এই যে আমটি দিয়েছিলেন এটি রেখে গেলাম।"

"কেন, আম খাবে না কেন ?"

"না মা, এ বছর এখনো তো বঙ্কুবিহারীজীকে আম উৎসর্গ করতে পারি নি। নতুন জিনিস দেবতাকে উৎসর্গ না করে খাওয়া যে পাপ।"

"তা এখানেই বঙ্কুবিহারীর নামে নিবেদন করে খাও না—ভগবান তো আছেন সব জায়গায়ই।"

আমার এ কথায় জ্ঞানদাসীর মন সায় দেয় না। একটু চুপ করে থেকে বলে, "তা হলেও মা, প্রতি বৎসরই মন্দির-দেবতাকে ভোগ দিয়ে তবে নতুন জিনিস প্রসাদ পাই। দুদিন বাদেই ওখানে যাচ্ছি। বঙ্কুবিহারী রইলেন বৃন্দাবনে আর এখান থেকে যদি তাঁকে আম উৎসর্গ করি তবে যে আমের লালসায় নিজের লোভের পূজো করা হবে মা। তা ছাড়া ঠাকুর যে আছেন সব জায়গায় সে জ্ঞান কি আর আমাদের মত মুখ্যুসুখ্যু মানুষের হয়েছে মা! বঙ্কুবিহারীজীকে দিয়ে তবে প্রসাদ পাব।"

বৈষ্ণবীর যুক্তি ও নিষ্ঠায় মন ভরে ওঠে। কী অদ্ভুত একনিষ্ঠ ভাব। 'রসনা বিজয়ে বাসনা বিজয়' কথাটি বৈষ্ণবীর চলন-বলনে সুপরিস্ফুট।

বললাম, "আচ্ছা রেখে যাও ঐ তাকের উপর। কালই তো যাচ্ছ বৃন্দাবন, ওখানে গিয়ে বঙ্কুবিহারীলালকে ভোগ দিও।"

জ্ঞানদাসী সযত্নে তাকের উপর আমটি রেখে দিয়ে চলে যায়।

খেয়ে উঠে মুখ ধুতে কলতলায় যাচ্ছি। বারান্দা পেরিয়ে শেষদিকে কল। ভৈরবী আহারে বসেছেন। বড় একটা জামবাটিতে খানকতক রুটি আর একটু কী যেন। আধো অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। মিটমিটে একটি প্রদীপ ঘরের কোণে জ্বলছে। জ্ঞানদাসী না খাওয়ায় হাঁড়িতে তখনও অনেক খিচুড়ি ও ভাজা ছিল। কিন্তু ভৈরবীও বৈষ্ণবীর মত রাত্তিরে অন্নগ্রহণ করেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে পাছে রেগে যান, তবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করি, "রাত্তিরে বুঝি আপনি ভাত-টাত খান না ?"

ভৈরবী জবাব দেন, "আমাদের দিবারাত্রি উভয়ই সমজ্ঞান করতে হয় মা। শঙ্কর যখন যা জোটান তখন তাই খাই।"

তবু অন্যের হাতের রান্না খাবেন কিনা জানি না, তাই ভয়ে ভয়ে বলি, "বৈষ্ণবীর জন্য রেঁধেছিলাম, উনি তো রাত্তিরে অন্ন খান না তাই অনেক বেশী হয়ে গেল। আপনাকে এনে দেব কি ?"

ভৈরবী সানন্দে সম্মতি দেন। ডেক্‌চি-শুদ্ধ নিয়ে এসে হাতা দিয়ে ঢেলে দিই ওঁর পাত্রে। খুশী হয়ে সবটা খিচুড়ি ভাজা খেয়ে নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুললেন ভৈরবী।

ওদিকে জ্ঞানদাসী বারান্দার একধারে বসে ছোট্ট পেতলের একটা বাসনে দুধ ছাতু কলা খেয়ে ঢক্‌ঢক্ করে ঘটি থেকে জল খাচ্ছে।

আমাকে ডেক্‌চি হাতে কলতলার দিকে যেতে দেখে ছুটে আসে জ্ঞানদাসী, "দিন মা, আপনার বাসন আমি মেজে দিচ্ছি।"

আমি আপত্তি জানাই ঃ "না বাছা, তুমি খেলে না, ছুঁলে না, বাসন মাজতে যাবে কেন ? এতটা পরিশ্রান্ত হয়ে আছ, বিশ্রাম কর গে। এ আমি রেখে দেব, রামলাল মেজে দেবে'খন।"

ধর্মশালার উঠোনের বড় আলোটা রাত দশটায় নিভে গেল। যে যার ঘরে ঘরে শুয়ে পড়েছে। বাইরের উঠোনেও শুয়েছে অনেকে খাটিয়া পেতে। গুমোট গরম এখানেও।

উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমিও দরজা ভেজিয়ে শুয়ে পড়ি। গরমে ঘুম আসছিল না। মনের মধ্যে ভীড় করে আসে যত এলোপাতাড়ি চিন্তা—বাড়ির কথা, পথের কথা। এই ভৈরবী ও বৈষ্ণবীর আকৃতি-প্রকৃতি ও আচার-ব্যবহারে আকাশপাতাল তফাত। অবাক হই বিভিন্ন ধর্মমতের পার্থক্যে। ভৈরবী করেন পঞ্চমকার সাধনা। ভোগবলিষ্ঠ চেহারা। কপাল জুড়ে প্রকাণ্ড সিঁদুর-টিপ। এই রক্তাম্বর ও রুদ্রাক্ষধারিণীর বড় বড় চোখের ধারালো চাউনি ও গুরুগম্ভীর আওয়াজে বুক করে ধুক্‌ধুক্‌। বয়েস হবে পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশ।

বৈষ্ণবীর চেহারা পাতলা ছিপছিপে। অনাড়ম্বর মুখখানা। শুভ্রবেশ, কপালে গোপীচন্দনের তিলক, গলায় তুলসীমালা। কথায়বার্তায় বিনীতভাব। দেখলেই মনে হয় ভক্তিপথের উপাসিকা। 'তৃণাদপি সুনীচেন' কথাটির সদ্ব্যবহার অনেক বৈষ্ণবই করে থাকেন—এই জ্ঞানদাসীর মধ্যেও তার ব্যতিক্রম নেই। একবার এক বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি। সাক্ষাৎমাত্রেই সেই অপরিচিত সাধুটি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। আমি তো মহা অপ্রস্তুত।

॥ ৫ ॥

আজ শ্রীশ্রীভোলাগিরি মহারাজের তিরোভাব-তিথি উৎসব। আশ্রমের বড় ফটকটি খুলে দিয়েছে সর্বসাধারণের জন্য। লোকজনে আশ্রমটি ভোর হতেই জমজমাট। প্রভাতে মঙ্গলারতি হোম, আটটায় গীতাপাঠ ও ব্যাখ্যা, নটায় ভজন গান, দশটা থেকে সাড়ে এগারোটা অবধি মহারাজদের বক্তৃতা, বেলা বারোটায় ভোগারতি।

আশ্রম-উৎসবে ধর্মশালাবাসী সবাই এবং শহরবাসী ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই নিমন্ত্রিত। আমরা বেলা নটায় আশ্রমে গেলাম। স্বচ্ছসলিলা ভাগীরথীতীরে এই মন্দিরটি বড় মনোরম। প্রশস্ত দরদালানের সামনে সারি সারি তিনটি ঘর—মাঝের ঘরে শিবলিঙ্গ, ডান পাশের ঘরে ভোলাগিরিজী ও বাম পাশের ঘরে শঙ্করাচার্যের মর্মরমূর্তি স্থাপিত। লোকে লোকারণ্য হলঘরটি। উদ্বোধন সঙ্গীত হচ্ছে—

'পদপ্রান্তে রাখো সেবকে
শান্তিসদন সাধনধন দেবদেব হে।—'

পরে মহাত্মাজীর প্রিয় ভজন রামধুন—

'প্রেমমুদিত মন্‌সে কহো রাম রাম রাম।
পাপ কাটে দুঃখ মেটে লেকে রাম নাম।—'

এই প্রার্থনা-সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সেই সত্যরূপী ভগবানের উপাসনায় সমগ্র জনতা যেন মন্ত্রমুগ্ধ। অপূর্ব মধুকণ্ঠী মেয়েটি।

দিল্লী থেকে আগত জনৈক অফিসার-নন্দিনী। নাম আরতি সেন। বি. এ. ক্লাসের ছাত্রী। সঙ্গীত শেষে আলাপ করে খুব ভাল লাগল। মিষ্টি কথাবার্তা মেয়েটির।

ভোর ছটা থেকে আশ্রমের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু হয়েছে। বেলা বারোটায় শেষ হল। এর পরে সাধুসন্তদের সেবাপর্ব। বারান্দায় সারি সারি বসেছে সাধুসন্ন্যাসীর দল। তাঁরা আনাগোনা করছেন, সামান্য দু-চারটে কথাবার্তা বলছেন ও নিঃশব্দে আহার্য গ্রহণ করে যাচ্ছেন। এই সাধুদের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মেয়ে ও পুরুষের ভীড়।

আয়োজন প্রচুর। পুরি কচুরি ডাল ডালনা অমৃতি লাড্ডু চাটনি ও দইয়ের শরবত। এরপর চলে সর্বসাধারণের ভোজনপর্ব। সে এক বিরাট জনতা। উঠোনে বারান্দায় হলঘরে অতিথিশালায় লোকজন গমগম করছে। কথাবার্তা হাঁকডাক চলে অবিশ্রাম। দরিদ্রনারায়ণগণের সেদিন মহা সুদিন।

ভেতরের উঠোনে মাঝখানটায় কিছু ফুলের গাছ লাগানো। বাইরে গঙ্গার ধারে গাছের ছায়ায় বসে এক বাউল গান ধরেছে—

গুরু তোমার চরণ পাইমু বইলারে
বড়ো আশা ছিল।
আশা-নদীর পারে বইসারে
আমার বেরথাই জনম গেল।
অ বড় আশা ছিল॥

সঙ্গে একতারা বেজে চলে টিং টিং টিং। গঙ্গার হাওয়ায় সেই উদাসী সুর ভেসে যায় সুদূর দিগন্তে, মিলিয়ে যায় হয়তো বা অজানা গুরুর উদ্দেশ্যে।

॥ ৬ ॥

আহারান্তে আমরা ও বুড়ো মা রওনা হই হৃষীকেশে। রাত্রিটা কালীকম্লীওয়ালার ধর্মশালায় কাটিয়ে ভোরের বাসে রওনা হই দেবপ্রয়াগ অভিমুখে। ছোট ছোট চোদ্দটা চটি পেরিয়ে এসে যায় দেবপ্রয়াগ। যে যার বাস থেকে নেমে পড়ে—কেউ বা আহার্যের, কেউ বা পানীয়ের আর কেউ বা দু ঘণ্টায় খিলধরা হাত-পাগুলোকে একটু ছাড়িয়ে নেবার উদ্দেশ্যে।

যত উপরে উঠছি জিনিসপত্রের দামও ততই বাড়ছে। বাস এখানে বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়ায়। বহুলোক দু-একদিন এখানে থেকে ভাগীরথী ও অলকানন্দা সঙ্গমে স্নান ও পিতৃ-পুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানাদি করে থাকেন।

বুড়োমা ও উনি নেমে গেছেন। আমি বসে আছি বাসে। দূরে দেখা যায় সুউচ্চ শৈলমালা। সেই দুর্গম পাহাড়ের বুকে বেঁকেচুরে উঠেছে পথ। নীচে ছুটে চলেছে অলকানন্দা। অবাক হয়ে চেয়ে দেখছি অম্বর ও অবনীর মিলনমেলা। দেখছি আকাশের নীল ও বনানীর সবুজ শোভা যেখানে অখণ্ড নীরবতায় পরস্পর-লীন—ভগবানের সেই ভূমানন্দময় রূপ।

যুগে যুগে মর্ত্যের জীব ছুটে চলেছে ওই সঙ্কট-সঙ্কুল গিরিপথে, মৃত্যুর ভয় তুচ্ছ করে অমৃতলোকের সন্ধানে।

"মাঈজী আপ কাঁহা যায়েঙ্গে?"

মুখ ফিরিয়ে দেখি একটি প্রবীণা মহিলা। জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। দৃষ্টি বিনিময় হতে আবার জিজ্ঞাসা করেন, "আপ কাঁহা যায়েঙ্গে মাতাজী?"

"ম্যায় তো বদ্রীনাথধাম যা রহী হুঁ।"

"আপ্‌কে সাথ ঔর কৌন হ্যাঁয় ?"

"মেরে সাথ মেরে পতিজী হ্যাঁয়। ক্যা, আপকে সাথ ঔর কৌঈ নহীঁ ?"

"নেহীঁ, মাতাজী ম্যায় একেলী হুঁ। বদ্রীবিশালজীকে চরণদর্শনকে লিয়ে চল্‌ রহী হুঁ।"

"আপ কুছ চিন্তা ন কীজিয়ে, হম্‌ আপকো জরুর লে চলেঙ্গে।"

মহিলাটি আমার কথায় কাছে এসে বসেন। আমিও ঘুরে মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করি নানা কথা।

মহিলাটির নাম শ্রীমতী রুক্‌মিনিয়াম্‌ নাইডু। মাদ্রাজী। ওঁর স্বামী মারা গেছেন অনেক দিন। ছেলে নেই, দুটি মেয়ে। বড়টি থাকে মাদ্রাজে, ছোটটি ছিল কলকাতায়। ত্রিশ বছর বয়সে এই ছোট মেয়েটি পতিপুত্র রেখে মারা যায়। সেই থেকে শোকসন্তপ্ত উদাসীন মন ওঁর তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াবার জন্য ব্যাকুল। বম্বেতে থাকেন ভাইপোদের কাছে, ওরাই পাঠিয়েছে ওঁকে হরিদ্বারে। এখন একাই চলেছেন বদ্রীনাথের পথে।

হৃষীকেশ থেকে বারবার বাস বদল করতে করতে তরুণরাই হিমসিম খায়, আর এই বৃদ্ধা নারী কী অসীম সাহসে একা চলেছেন ওই পথে! এরকম মানুষই তো ভগবৎ-কৃপালাভের যথার্থ অধিকারী। ধনজন-মানের বন্ধনই মানুষকে বেঁধে রাখে সংসার-কারায়। যার সে আসক্তি ফুরোয়, একমাত্র সে-ই পারে পরমশরণের আশ্রিত হতে। মানুষ অর্থ যশ মানের মোহেই নিরন্তর আবর্তিত হয়ে চলেছে।

অতৃপ্তির গ্লানি ও পরাজয়ের ব্যথায় ভরে ওঠে মন, তবু ফুরোয় না বাসনার বিকার।

গীতায় শ্রীভগবান এই ক্ষুব্ধ জনগণকে বলেছেন—

'সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ

অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।'

হে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত মানব, তোমরা সর্বথা আমার আশ্রিত হও। তোমাদের সকল গ্লানি, সকল দুঃখসন্তাপ হতে আমিই তোমাদের ত্রাণ করব।

কিন্তু পারি কি সেই সম্যক্ আত্মসমর্পণের মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করতে? মানুষের মনে নেই আজ আগেকার সেই সহজ অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা, নেই পূর্বের সেই একাগ্র একনিষ্ঠ ভাব। পৃথিবীর সর্বধর্ম আজ প্রাণহীন। বিশ্ব আজ ভোগ ও স্বার্থের উন্মাদনায় বিকারগ্রস্ত। রাজ্যেশ্বরের বাসনা সসাগরা ধরণীর অধিপতি হবার, লক্ষপতির ইচ্ছা ক্রোরপতি হবার, যত পাই আরও চাই— স্বার্থের এই সর্বগ্রাসী আগুনে বারবার পৃথিবী ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলে।

"ধর" বলে দু-কাপ চা ও দুধ নিয়ে বাসের জানলার পাশে এসে দাঁড়ান উনি। যাত্রীরাও যে-যার জায়গা দখল করে বসে। নাইডুর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই ওঁর। বুড়োমা নাইডু উনি আমি চারজনে চলে কথাবার্তা। সেদিন থেকেই আমরা হলাম চার সঙ্গী।

গাড়ি দেবপ্রয়াগ ছেড়ে চলল। পাহাড়ের গা ঘেঁষে আঁকাবাঁকা পথ। কোথাও পাহাড় পথের উপর এমনি ঝুঁকে পড়েছে যে সন্তর্পণে পথ পার হতে হয় গাড়ির চালককে— নইলে বিপদ। এমনি বাঁকের পর বাঁক ঘুরে চলেছি।

ক্রমাগত চৌষট্টি মাইল পেরিয়ে গরমে ও ঝাঁকুনিতে অর্ধসিদ্ধ দেহটাকে নিয়ে মাটির বুকে যখন আশ্রয় পেলাম বেলা তখন তিনটে। গাড়ি এসে থামে তার শেষ গন্তব্যস্থল কীর্তিনগরে।

এর পর পুল পেরিয়ে ওপারে গিয়ে গাড়ি ধরতে হবে শ্রীনগরের। বহু যাত্রীই চলে গেল ওপারে তখনই গাড়ি ধরার জন্য। আর ঘণ্টা দুই পর ওপার থেকে বাস ছাড়বে। মাথার উপর কড়া রোদ। তাই কাছের ধর্মশালায় উঠে বিশ্রাম ও খাওয়াদাওয়া সেরে ওপারে যাব। আর একটি বাঙালী পরিবারও উঠল এই ধর্মশালায়।

একটু বাদেই "চলিয়ে বাবুজী, খানা তৈয়ার হ্যায়" বলে হোটেলওয়ালার তাগিদ আসে। বুড়োমার জন্য ফলমূল মিষ্টি সব গুছিয়ে রেখে বলি, "মা, আপনি হাত পা ধুয়ে খেয়ে নিন।"

মা ততক্ষণে ওই বাঙালী যাত্রীদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছেন। বললেন, "আপনারা খেয়ে আসুন গে। আর আপনাদের এই বান্ধবীকেও সঙ্গে নিন, খেয়ে আসুক। আমি সময়মত খেয়ে নেব'খন।" পাহাড়পথে রাত্তিরে গাড়ি চলবে না। কাজেই আমাদের একটু তাড়াতাড়িই যেতে হবে। সময়মত বাস না পেলে মুশকিলে পড়তে হবে ভেবে যথাসম্ভব তাড়াতাড়িই চলে যাই হোটেলের দিকে। যেতে যেতে ভাবি বুড়োমার মনটা হয়তো ভাল নেই। কিন্তু কেন? অপরিচিতাকে 'বান্ধবী' বলা অশোভনই শুধু নয়, ভারি বেসুরা ঠেকে। মনটা খচখচ করে।

সোজা গিয়ে দোতলায় উঠলাম। মাটির মেঝে। পাহাড়ের গা ঘেঁষে তৈরী করেছে ঘর। পেছনের দরজাটা খুলে দিতেই হাতে ধরা যায় পাহাড়। শতরঞ্জি পেতে তিন গ্লাস জল দিয়ে গেল একটি অল্পবয়সী ছেলে। হোটেলে তখন

অন্ন আর ভোজনার্থী কেউ ছিল না। শতরঞ্জির উপর পাশাপাশি খেতে বসলাম নাইডু উনি ও আমি। একটু পরেই তিনখানা বড় থালায় নিয়ে এল রাশীকৃত ভাত, বাটিতে ডাল, একটু তরকারি আর পেঁয়াজ ও তেঁতুলের চাটনি। খেতে খেতে ওদের রান্না দেখে কান্না পাওয়ার অবস্থা। ভাত কোন্ কালের যেন রান্না করা, ঠাণ্ডা কড়কড়ে; ডাল নয় তো, জলের দ্বিতীয় সংস্করণ, তরকারি যেমন ঝাল, নুনও তেমনি। চাটনি মানে পেঁয়াজ-লঙ্কাগোলা আর কি। পেঁয়াজ আমি খাই না। সুতরাং কোনমতে ডাল ও ভাত একটু খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে নিলাম।

বুড়োমা জিজ্ঞেস করেন, "কি খেলেন, কেমন রান্না হয়েছিল?"

"আর খাওয়া! পাহাড়ীদের রান্না তো! স্বাদ-সোয়াদের কোন বালাই নেই। সেই থোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়। জিনিস ওই আলু আর পেঁয়াজ, মায় চাটনিতেও পেঁয়াজ। ওটা আবার আমার বাদ।"

হেসে জবাব দেন বুড়োমা, "একেই বলে মা ত্যাগস্বর্গের পথ। এ পথের পথিক যারা তাদের আহার নিদ্রার আরাম-বিলাস ত্যাগ করেই বেরোতে হয় যে। তা ছাড়া খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দেবপ্রয়াগে ভাল। তাই অনেকে ওখানে দু-একদিন থেকে পরদিন একেবারে শ্রীনগরে গিয়ে বিশ্রাম করে। নয়তো এই চৌষট্টি মাইল পাহাড়পথের ঝাঁকুনিতে শরীরে কিছু থাকে না।"

ভাবি, সত্যিই তাই, এটা ত্যাগস্বর্গই বটে। আমাদের আরাম বিলাস ও চাহিদার অন্ত নেই। আর ওদের নেই বিলাসের ব্যাসক্তি।

এই পাহাড়ীদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা দেখে অবাক লাগে। এদের শীতাতপ-সহনশীলতায় আশ্চর্য হতে হয়। চালের ব্যবস্থা রাখে শুধু বাঙালী যাত্রীদের জন্যেই বেশী। ওদের দৈনন্দিন খাদ্য ডাল-রুটিতেই ওরা তৃপ্ত। চর্ব্যচোষ্য লেহ্যপেয়ের জন্য নেই রসনার তাড়না, শীত নিবারণ করে ওরা একটিমাত্র কোট ও কম্বলে।

ইতিমধ্যে এক মুটে এসে হাঁক দেয়, "চলিয়ে মাঈজী, গাড়িকা টাইম হো গিয়া। ম্যাঁয় চড়া দেতা হুঁ। কঁহা হ্যাঁয় সামান্ ?"

বুড়োমাকে বললাম, "একে তো আমাদের মুটে বলে মনে হয় না! আপনি দেখুন তো মা।"

যে মুটে আমাদের মাল নামিয়েছিল দূর থেকে সে দেখতে পেল অন্য মুটে ওর মালে বাগড়া দেবার তালে আছে। দৌড়ে এসে যায় সে। বচসা চলে দুজনে। "চল্ হট্ তু, কাঁহাসে আয়া মাল উঠানেওয়ালা ? চলিয়ে মাঈজী, বাবুজী কাঁহা ?"

"তুম ঠার যাও, বাবুজী আতে হ্যাঁয়।" বুড়োমা বললেন।

উনি ফিরে আসেন টিকিট নিয়ে। মুটেকে জিজ্ঞেস করেন, "কিতনা মাঙ্গতা হ্যায় ? শ্রীনগরকা বাসমে চড়ানা হোগা।"

"তিন রূপয়ে দীজিয়ে গা।" বলে মুটে।

"ক্যা ? এক এক সামানকে লিয়ে চার চার আনাকে যাস্তি নহীঁ। কুল্ মিলাকর দেড় রূপয়ে হোতে হ্যায়।"

"নহীঁ বাবুজী, সামান বহুৎ ভারী হ্যায়। ঔর অটায়ে দীজিয়ে গা।"

"আচ্ছা মিল যায়গে, উঠাও সামান।"

দরাদরির এখন সময় নেই। তাড়াতাড়ি না করলে গাড়ি ছেড়ে দেবে। লটবহর সব মুটের মাথায় চাপিয়ে ঝোলা লাঠি ফ্লাস্ক নিয়ে আমরাও চলতে থাকি। দূর থেকেই দেখা যায় গঙ্গাব্রীজ, কিন্তু তার আগে বেশ খানিকটা ঢালু সংকীর্ণ পথ পেরিয়ে ব্রীজ ধরতে হবে। যদি কোন মতে পা ফস্‌কে যায়, একেবারে সলিলসমাধি। বুক ঢিপ ঢিপ করে। সন্তর্পণে লাঠির সাহায্যে পা টিপে টিপে ভগবানকে ডাকতে ডাকতে এগুতে থাকি। কিন্তু সংশয় যেখানে, সংকটও ফেরে তার পেছনেই। ব্রীজের উপর 'সামালকে' শব্দটি কানে যেতেই পাশ কাটিয়ে হুঁশিয়ার হই, কিন্তু অতর্কিতে এক মুটের মালের ধাক্কা এসে লাগে চোখের কোণে। কোনরকমে টাল সামলে নিই। চোখের চশমা আর একটু হলেই ছিটকে পড়েছিল গঙ্গায়। হাত দিয়ে ধরে ফেলি। বেঁচে গেলাম ভগবানের দয়ায়।

॥ ৭ ॥

সন্ধ্যায় এসে যাই শ্রীনগর। রাস্তার দুপাশে আলো জ্বলে উঠেছে, সারি সারি দুপাশে দোকানপাট। পুরনো বড় শহর। বাবা কমলাক্ষ শিবের মন্দির এখানে প্রসিদ্ধ।

ধর্মশালায় উঠলাম। দ্বিতল ধর্মশালা, তার চারদিক ঘিরে প্রকাণ্ড চত্বর। উঠোনে ও ঘরে ঘরে যাত্রীর ভীড়। অবিশ্রাম চলে তাদের কথাবার্তা হৈ-হল্লা। জিনিসপত্র রেখে ছুটি কলতলার দিকে—গরমে অস্থির। সেখানে গিয়েও

দেখি, লোকে লোকারণ্য। হিন্দুস্থানী, মারাঠী, মাদ্রাজী, বম্বেওয়ালা নানা জাতির সমাবেশ।

উঠোনের একপাশে কল। চতুর্দিকে এমন ভীড় জমেছে যে সেই ব্যূহ ভেদ করে স্নানের ইচ্ছা ছেড়ে দিয়ে বসে থাকি বারান্দার একপাশে। মাঝখানে একটি গ্যাসলাইটের মিটিমিটি আলো জ্বলছে। ছায়ার মত অগণিত মানুষের আনাগোনা, কথাবার্তার বিচিত্র সুর। বসে বসে দেখছি ঐই বিপুল বৃহৎ প্রাণের মেলা। অন্তরের গভীর তৃষায় মিলিত হয়েছে একত্রে সবাই। একই পথের নিশানা ধরে চলেছে সব।

"মাঈজী, তুমহারী গোসল হো গয়ী?" ক্লান্তিহীন হাসিমুখে সামনে এসে শুধায় নাইডু।

উত্তর দিই, "নহীঁ মাতাজী, ইত্‌নি ভীড় মে কৈসে নহাউঁ?"

"তুম্ ইয়হী ব্যায়ঠ যাও মাতাজী, তুমহারী লিয়ে পানী লিয়াতী হুঁ।" বলে নাইডু জলের জন্য চলে যায় কলের দিকে। স্নানান্তে দুজনে ঘরে ফিরি।

বুড়োমা এরই মধ্যে গা ধুয়ে এসে রান্নার যোগাড় করছেন। আমাকে বললেন, "বল তো মা, কতটা ডাল চাল নেব? এতেই হবে তো?"

"তা হবে। মাদ্রাজী মায়ের জন্য আর একটু নিন।"

"তার মানে? সঙ্গ ধরেছে বলে রেঁধেও খাওয়াতে হবে? নিজে রেঁধে নিক না। ইড্‌লি মিড্‌লি যারা খায়, খাবে তারা আপনার রান্না?"

"আমি বলেছিলাম সে কথা, বলেন ভিন্ন করে কি হবে—আপনারা যা রাঁধবেন তাই একটু দেবেন। এই বলে ওঁর

ব্যাগভর্তি জিনিস আমাদের জিনিসের পাশে ঐ যে রেখে দিয়েছেন।"

"হুঁঃ, জিনিস উদ্ধার দিয়ে করেছেন। ভাল বান্ধবী জুটেছে দেখছি। এ নিয়ে আপনাদের ভোগান্তি আছে দেখবেন।"

যা আছে তা আছেই। কথায় আর যোগান না দিয়ে রান্নার যোগাড় করি।

উনি মুটে রেজিস্ট্রি করে নিয়ে এলেন। ছেলেটি নেপালী। নাম নন্দপ্রসাদ। হাসিখুশী দিব্যি চেহারাটি। বয়স পঁচিশ হবে। আমাদের বিছানাগুলো খুলে ঠিক করে পেতে দেয়। জিনিসপত্রগুলো ঠিকমত গুছিয়ে রেখে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, "আভী ঔর কুছ কাম হ্যায় মাতাজী?"

বুড়োমা বললেন, "নেহী, আভী ঔর কুছ জরুরৎ নেহী। কল্ সবেরে জল্‌দি আনা চাহি।"

'আচ্ছা মাঈজী' বলে চলে যায় নন্দপ্রসাদ।

ধর্মশালার কাছেই ওর ঘর। পঞ্চাশ টাকায় ওর বদ্রীনাথ যাতায়াত ঠিক করা হয়েছে।

সমস্ত দিনের ক্লান্তি অবসাদ আনে শরীরে। যে যার খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ি। সারি সারি বিছানা পাতা। আমার বিছানার পাশেই বুড়োমা ও নাইডুর বিছানা। বুড়োমা বিছানায় বসে জপ করছিলেন। নাইডু ছিলেন চোখ বুজে। হাতে পাখা নিয়ে আমি বিছানায় যেতেই বললেন, "তুম সো যাও মাঈ, ম্যায় তুমকো হাওয়া দেতা হুঁ।" নাইডু থামতেই শুনি বুড়োমা নিজের মনে বলে যাচ্ছেন, "হুঁ, মনবাঁধার আট-ঘাটটি ঠিক জানা আছে। হরি হে দীনবন্ধু—নারায়ণ নারায়ণ!" বলতে বলতে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস শূন্যে মিলিয়ে দিয়ে আবার জপে মন দিলেন।

গরমের জন্য পাখাখানা আমার সঙ্গেই ছিল। আমার হাত থেকে পাখাখানা নিয়ে হাওয়া দিতে আরম্ভ করলেন নাইডু। কোন আপত্তি আমার শুনলেন না। কি আর করি। ক্লান্ত দু চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে।

শ্রীনগরেও যথেষ্ট গরম। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যায় গরমে। উঠে বসি, গরম সইতে পারি না মোটেই। উনি বুড়োমা নাইডু সবাই অকাতরে ঘুমুচ্ছেন। হাওয়া দিচ্ছি এঁদের, আর দেখছি সীমাহীন দিগন্তের অন্তহীন কালো রূপ।

সেই আঁধার পারাবারে জ্বলছে অসংখ্য তারার দীপ। মেঘমুক্ত আকাশের বুকে নিস্তব্ধ নীহারিকাপুঞ্জ তৈরী করেছে আলোর সেতু।

নিষুতি রাত। যাত্রীরা গভীর ঘুমে অচৈতন্য। 'শুধু মাঝে মাঝে শোনা যায় কলহপ্রমত্ত কুকুরের চীৎকার। উড়ে যায় নিশাচর পাখী, ডানা ঝাপটানোর শব্দ হয় ঝটপট—সোঁও, সোঁও, সোঁ।

আকাশের বুকে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে আছে পাহাড় নিশ্চিন্ত মনে। গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে কর্তব্যপরায়ণ প্রহরীর মত। শুকতারা তাকিয়ে আছে ঘুমন্ত ধরিত্রীর মুখের দিকে।

রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ক্রমেই তরল হয়ে আসছিল। ফর্সা হয়ে উঠছে পুবের আকাশ। ধীরে ধীরে পূর্বাশার ভালে মিলিয়ে যাচ্ছে শুকতারা, বিদায়ব্যথায় বিধুর হয়ে উঠছে তার বিষণ্ণ নয়ন। শেষরাত্রির যাত্রীদের চলছে যাবার প্রস্তুতি। শব্দ শোনা যায় টুং টাং ঠুক ঠাক।

বাইরের লাইটপোস্টের আলো এসে পড়েছে নাইডুর ঘুমন্ত মুখের উপর। একটা শান্তশ্রী মাখানো মুখখানা।

ঘুমের মধ্যেও যেন একটা স্নিগ্ধ হাসির রেশ লেগে আছে মুখে।

এই বৃদ্ধার জীবনকাহিনী শুনতে শুনতে ব্যথায় বুক ভরে যায়। অভিজাত ঘরের মেয়ে ও বধূ ইনি। স্বামী ছিলেন বড় চাকুরে। তখন ছিল আত্মীয়স্বজনে পরিবৃত সংসার, আর এখন একা পথচারিণী। বিগতদিনের কথা বলতে বলতে চোখ দুটি হয়ে ওঠে জলভারনত মেঘের মত, কিন্তু তার মধ্যেও মুখে জড়িয়ে থাকে একটি স্তিমিত হাসির রেখা। কথায় ও ব্যবহারে নেই কোন বিমর্ষভাব বা অসন্তুষ্টি, কাজে নেই কোন আলস্য বা বিরক্তি। নাইডুর দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে একটি কথা—"যৌবনান্তে জীবনের আনন্দ চলিয়া গেলেও মানুষ আনন্দসৃষ্টির প্রয়াসী হয়। বার্ধক্যের এই আনন্দ যৌবনের উচ্ছল উচ্ছ্বাস নয়। ইহা অশ্রুভারাক্রান্ত, ইহার অন্তরালে ব্যথার সমুদ্র উদ্বেল হইয়া আছে।"

ভোর হয়ে গেছে। যাত্রীরা যে যার পোটলা পুঁটলি বেঁধে নিয়ে ভোরের বাস ধরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। বেশীর ভাগ লোকই ভোরের বাসে চলে গেল দলে দলে। ফাঁকা হয়ে গেল ধর্মশালা। আর যারা রইল তাদেরও চলি চলি ভাব।

ধর্মশালায় দুটো উঠোন—একটিতে যাত্রীনিবাস, অন্যটিতে চায়ের দোকান, আর মধ্যখানে লক্ষ্মীনারায়ণের মন্দির। স্নানের কলও এদিকটাতেই। কাজেই স্নানান্তে দেবতাদর্শন ও চা পান দুই কাজই চলে।

বুড়োমা খুব ভোরে উঠেই স্নানে গেছেন। নন্দপ্রসাদ এলে বাসনপত্তর মাজা ও জামাকাপড় কাচার ভার ওকে দিয়ে স্নানের জন্য তৈরি হচ্ছি।

"এই যে মা জননী, তোমার জন্যে সব্জী ও আম কিনে নিয়ে এলাম।" বলে বুড়োমা একঘটি জল ও কিছু কাঁচা আম আর তরকারি মেঝেতে রাখলেন।

বুড়োমা জানতেন টক আমি ভালবাসি। কিন্তু এখানে এসব মেলা দায়, তাই অবাক হয়ে বলি, "কোথায় পেলেন মা এসব?"

হেসে জবাব দেন বুড়োমা, "ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলেই মিলে যায়-মা। স্নান করে মন্দির থেকে ফেরার পথে ভাবলাম দেখে যাই ওদিকের দোকানগুলো। দেখি এক দোকানে একটি ছোকরা কিছু সব্জী ও কাঁচা আম নিয়ে বসে আছে। কিনতে কিনতে ভাবলাম, একেই বলে—যিনি খান চিনি, তার চিনি জোগান চিন্তামনি। সেদিন পেঁয়াজের জন্য তেঁতুলের চাটনি খেতে পার নি, আজ তাই আম পাঠিয়ে দিলেন। এ সবই ঠাকুরের ইচ্ছা।"

হেসে বলি, "সে কথা ঠিকই। চিনি তিনি ঠিকই জোগাচ্ছেন, আর আমরা সেই চিনি খেতে গিয়ে চিন্তামনিকেই ভুলে বসি। আপনি কুটনো কেটে দিন মা, আমি চট করে নেয়ে আসি।" বলে কলতলার দিকে যেতে দেখতে পেলাম নাইডু ক্ষিপ্রপদে আসছেন। ওঁর স্নান হয়ে গেছে। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন, "মাঈ, জলদি নাহান কর লো, আভী তো পণ্ডাজী পূজা মে ব্যায়ঠা হ্যায়!"

কলতলায় তখন ভীড় নেই, একেবারে ফাঁকা। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিই। মন্দিরে গিয়ে দেখি পূজারী-ঠাকুর পূজার জোগাড় করছেন। আমরাও প্যাঁড়া সন্দেশ ভোগ দিলাম। তিনি আরতি শেষে গীতাপাঠ শোনালেন। পাঠশেষে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে পূজারীঠাকুর বলেন,—

নমো কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে
প্রণতঃ ক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

নাইডু চোখবুজে স্তুতি করেন—

হরে মুরারে মধুকৈটভ হারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণু
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

মন্দিরে শ্বেতপাথরের লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ। জায়গাটি বেশ নিরিবিলি। বারান্দায় বসেছিলাম। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া যেন আদুরে মেয়ের মত সারা গায়ে লুটোপুটি খাচ্ছিল। ইচ্ছা হয় বসে থাকি এইখানটায়। কিন্তু দুটোর বাস ধরার তাড়া আছে। ওঠার আগে প্রণাম করি—

পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমম্
পবিত্রং পরমানন্দং ত্বং বন্দে পরমেশ্বরম্ ॥

নির্মাল্য ও প্রসাদ নিয়ে ঘরে ফিরে আসি। বুড়োমা কুটনো কুটছিলেন, রান্নাও চাপিয়ে দিয়েছেন। নন্দপ্রসাদ দোতলার বারান্দায় কাপড় শুকতে দিচ্ছিল। নাইডু কফি তৈরী করে সবাইকে দিলেন। আমি সবাইকে প্রসাদ দিয়ে রান্নার কাজে লাগি। উনি বুড়োমা নন্দপ্রসাদ সবার চলে গল্পসল্প। বুড়োমা নন্দপ্রসাদকে নন্দলাল করে সহজ করে নিয়েছেন। নাইডু বলেন, "নন্দ্‌গোপাল ভী আচ্ছা হ্যায়।"

নাইডু একটি নীল কাপড়ের ব্যাগ এগিয়ে দেন, "মাঈজী, ইসিমে রসুই কি লিয়ে সভী চিজ হ্যায়, তুম খানা পাকা লো।" ব্যাগটির মধ্যে একে একে ডাল চাল চিনি পাঁপর আচার দুধ কফি মশলাগুঁড়ো পরিপাটি করে বিভিন্ন থলিতে সাজানো।

নাইডুকে বলি, "আভী রসুই হো গিয়া, ইয়ে রাখ দিজিয়ে আপকো পাস্।"

তবু মিনতির সুরে বলেন, "নেহী মাতাজী, ম্যায় আলেগ কাঁহা রাখুঙ্গী ? তুম্ সব একসাথ কর রাখ দো মাঈ।" বলে ব্যাগটি ও পথ-খরচার টাকাটাও দিলেন আমার হাতে। টাকা রাখতে আপত্তি জানাই। 'নিজের ইচ্ছামত খরচ করবেন' বলি ওঁকে।

—"তুমহারী পাস ঠিক রহেঙ্গে মাঈ, ম্যায় তো বুড্ঢা হ্যায়।" নাইডুর নির্ভরশীল করুণ দৃষ্টিতে হার মানে মন।

চলেছেন শীতের রাজ্যে। অথচ সম্বল মাত্র দুখানা শাড়ি, দুটো সাধারণ ব্লাউস্, একটি ব্যাগ, একটি শতরঞ্জি। আর ঐ ব্যাগের মধ্যে যা খাদ্যদ্রব্য ও পথ-খরচার কটি টাকা। কাজেই নিজের জিম্মায়ই রাখলাম, যা দরকার এখান থেকেই সংগ্রহ করে নিতে হবে। নইলে উপরে গিয়ে কষ্ট হবে, বুড়োমানুষ।

নাইডু, তামিল ও তেলেগু দুই-ই বলতে পারেন সমান দক্ষতার সঙ্গে। ইংরেজী ও হিন্দী জানেন সামান্য। তাই দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে চলে আমাদের কথাবার্তা। বুড়োমাকে ডাবেন্স আম্মা, ওঁকে ভেইয়া, আমাকে মাঈজী।

ভাল হিন্দী আমিও জানি না, কিন্তু কথা বলতে হয় প্রচুর। কারণ আমাকে নাকি নাইডুর মেয়ের মত লাগে, তাই ঠেকা দিয়ে কাজ চালিয়ে যাই। কথা যা-ও বলেন তা আমাতে-ওঁতেই হয় বেশীর ভাগ। আমাদের এই কথাবার্তায় বুড়োমা যোগ দেবার পরিবর্তে অভিযোগ করেন, "ইকির মিকির কত যে মন্তর পড়া হচ্ছে। সার ঐ হাত নাড়া আর মুখ নাড়া—বাব্বাঃ।

হনুমান নাড়ে হাত পা সীতা নাড়ে মাথা
বুঝিতে না পারে কেহ নরবানরের কথা ॥"

এই মন্তব্যে হেসে উঠি সবাই।

॥ ৮ ॥

পাশের ঘরে একদল বম্বেওয়ালা এসেছে। ধনী পরিবার। কেদার-বদ্রী-যাত্রী। নাইডুকে দেখে খুশী মনে আলাপ্র করে ওরা। কথা শেষে বললে, "মাতাজী, আপ বম্বাই পর যাকে মেহেরবানী সে হামারা কোঠী মে যাইয়ে গা।" ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণতি জানায় নাইডুকে। প্রত্যুত্তরে নাইডু জানান আশিস ও যাবার প্রতিশ্রুতি।

এই বিদেশিনী বৃদ্ধাকে সহযাত্রিণী করে নিতে আপত্তি ছিল বুড়োমার। ওঁকে বলেছিলেন, "এই বুড়োমানুষকে যে সঙ্গে করে নেবেন, যে দুর্গম পথ, যদি অসুস্থ হয়ে পড়ে, যদি না চলতে পারে সমানতালে, তবেই হবে মহা ফ্যাসাদ। এখনও সেটা ভাল করে ভেবে দেখুন।"

উনি শান্তিপ্রিয় নির্ঝঞ্ঝাট লোক। কারও আবাহন-বিসর্জনে নেই। বললেন, "তাই তো কি করা যায়? কি করেই বা না বলি—মহা সমস্যা!"

কোনও সমস্যার পরিবর্তে এই বৃদ্ধা নারীর জন্য মনটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে ওঠে, বলি, "করা না করার কি আছে এতে? একাই তো যাচ্ছিলেন, না হয় আমাদের সঙ্গেই যাবেন। সুস্থ শরীর অসুস্থ হতে কতক্ষণ? সে তো সবার পক্ষেই সমান। কিন্তু একথা নিশ্চিত, যাঁর ওপর নির্ভর করে একা ইনি এই দুর্গম পথে চলেছেন, তিনিই পথ দেখিয়ে

ঠিক নেবেন এঁকে। এজন্য ভাবনা বা সমস্যার কিছু হবে না দেখো।"

বুড়োমা বললেন, "কেন, ওর নিজের দেশের কত লোক তো যাচ্ছে দলে দলে, সেসব দলে ভিড়লেই হত—অত আত্মীয়তা কিসের? বুড়োমানুষ নিয়ে ওই পথে চলা বড় দুর্গতি।"

হাসি পায় বুড়োমার কথায়। হায় রে, নিজেরাই বা কি যুবতী! তবু মুখে বলি না কিছু। বয়োজ্যেষ্ঠা। কথার গরমিলে দুঃখ পাবেন মনে।

নিরুত্তরে ভাবি নাইডুর কথা। এঁর মধ্যে এমন একটা আন্তরিকতার ভাব, যা অগ্রাহ্য করা মূঢ়তারই নামান্তর।

অনেক সময় দেখা যায় অতি-অপরিচিত জনকেও মনে হয় যেন কত আপন, যেন কতকালের চেনা মুখখানি! অথচ দেখি নি কোনদিন! হয়তো বা পূর্বজন্মের স্মৃতি ঘুমিয়ে থাকে অবচেতন মনের অন্তরালে। এক্ষেত্রেও তাই কিনা জানি না। সন্তানহারা ওঁর মাতৃহৃদয় পেয়েছে কি কোন সান্ত্বনা, পেয়েছে কি কোন সমতা আমার মধ্যে? কীই বা দিতে পারি আমি তার বিনিময়ে? ভিনদেশীয়া হয়েও যিনি পরমাত্মীয়ের মত সঙ্গপ্রার্থনা করেন, তাঁকে বলা যায় কি 'আপনি আপনার পথ দেখুন।' এই সঙ্গহীনার আন্তরিকতাকে অমর্যাদা করা—সে কি হবে না পরম সত্যেরই অবমাননা?

আমাকে নিরুত্তর দেখে জবাব দিলেন উনি, "নাইডু যখন আমাদের সঙ্গেই যেতে চাইছেন, তখন না বলা চলে না। ডাণ্ডি-কাণ্ডি তো আছেই। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে'খন।"

বেলা দশটাতেই খাওয়া-দাওয়া শেষ। সবাই বিশ্রাম করছেন। বেলা দুটোয় বাস। বিছানায় একটু যে গড়িয়ে

নেব তারও উপায় নেই। তেতে-পুড়ে আছে সব বিছানা-গুলো। উঃ কী যে গরম! সুতরাং ঘুমের আশা ছেড়ে দিয়ে পাখা ও খাতাখানা টেনে নিয়ে বসি। কিন্তু বসেও কি ছাই সোয়াস্তি আছে? ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজে যায়—রোদের এমনি কড়া ঝাঁজ।

ওদিকে বুড়োমা ও ওঁর মধ্যে চলেছে যত রাজ্যের গল্প। বক্তা বুড়োমা স্বয়ং। শ্রোতা উনি। "এই তো দেখুন, আশ্রমের একদল ছেলে এসে ধরল সেদিন, চলুন মাসীমা আমাদের সঙ্গে আর একবার কেদারবদ্রী ঘুরে আসবেন, আপনি হবেন আমাদের গাইড। তপতীর মা বলল এসে, এবারে দিদিমা, আমাদের সঙ্গে বৃন্দাবনে যেতেই হচ্ছে আপনাকে। মেজো ছেলে চিঠি দিয়েছে, চল এবারে আমরা কাশ্মীর থেকে বেড়িয়ে আসি। নিজের ইচ্ছে ছিল একবার অমরনাথ থেকে ঘুরে আসার, কিন্তু ওই নানাদিকে নানাজনে টানাটানি করে। আর কি আমার শক্তি আছে অত ঘোরাঘুরির? পায়ে ব্যথা। হরিদ্বারের শান্ত পরিবেশই আমার ভাল, তাই চলে এসেছি এখানে। কিন্তু আবারও ঠাকুর টেনেছেন—সবই তাঁর ইচ্ছা। বিশেষ করে মায়ের আমার অনুরোধ এড়ানো আর সম্ভব হল না, এমনি মহামায়ার মায়া।" একটু থেমে আমার দিকে ঘুরে বললেন, "কি গো মা, কী লেখা হচ্ছে? ভ্রমণ-কাহিনী বুঝি?"

উদাস সুরে বলি, "নাঃ, ভ্রমণকাহিনী লিখবার মত বিদ্যে কোথায়? মেজোছেলে বলেছিল, যে পথে যাচ্ছো, যা পার কিছু লিখে এনো। তারই চেষ্টায় বসেছিলাম কিন্তু যা দুরন্ত গরম, প্রাণ আইঢাই করে। ধান ভানতে শিবের গান না শুরু হয়।"

উনি হেসে জবাব দেন, "মন্দ কি! গরমে যখন ঘুমবার উপায় থাকবে না শিবের গানই না হয় শোনা যাবে। ধান ভানতে শিবের গান শুরু হলে স্বার্থের পরিবর্তে অন্ততঃ পরমার্থ লাভ!"

"তাই তো এই লাভ-ক্ষতির খতিয়ানেই যে সারা দুনিয়া মশগুল।" বলতে বলতে উঠে পড়ি। সময় বেশী নেই, সব গুছিয়ে রাখি।

ইতিমধ্যে নন্দলাল এসে তাড়া দেয়, "বাবুজী, আভী তো গাড়িকো টাইম হো গিয়া।"

"তুম্ সব সামান লেকে স্ট্যাণ্ড পর চলা যাও। হম্‌লোগ আতে হ্যায়।" বলেন উনি। সবাই যাবার তোড়জোড় শেষ করে ফেলি। দুপুরের রোদে ঘামতে ঘামতে উঠে বসি সবাই বাসে। উনি ও বুড়োমা গেলেন টিকিট-ঘরে।

ওঁরা বাসে উঠতেই ডেকে বলি, "এই যে মা এদিকে আসুন।" আমাদের পাশেই বুড়োমার সীট রেখেছিলাম। তিনি চারদিকে একটু তাকিয়ে উলটো দিকের সীটে গিয়ে বসলেন। নির্লিপ্তভাবে বলেন, "নাঃ এই বেশ আছি।"

মনটা দমে যায়। যাকে অবলম্বন করে বদ্রীনাথের পথে বেরিয়েছি, যার সঙ্গে হরিদ্বারে গীতাপাঠ শোনা, গঙ্গায় বেড়ানো, সর্বোপরি একই ধর্মশালাবাসিনী হয়ে যে একটা আন্তরিকতার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল তার মাঝে একি ব্যবধানের প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

বুড়োমার আমার ওপর স্নেহের কার্পণ্য ছিল না, ছিল নাইডুর ওপর সৌহার্দ্যের অভাব। অথচ নাইডুর ছিল আমার প্রতি একটা সহজ অনুরক্তি যা থাকে সন্তানের ওপর মায়ের। সব সময় বুড়োমা এটাকে সহজ মনে মেনে নিতে

পারতেন না। আবার যখন সহজ হতেন, নাইডুকে বলতেন, মিতিন বা মিতাই। মনভার হলেই 'বান্ধবী' ও 'আপনি' শব্দ ব্যবহার করতেন। বুড়োমাকে নাইডুর সহজ করে পাবার যথেষ্ট সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না। কিছুটা ভীরুতা আর কিছুটা ভাষার বিরূপতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নাইডু (ভাঙা হিন্দীতে) বলেন, "ইনি তোমার কে হন ? মা, না শাশুড়ী ?"

একটু ভেবে বলি, "মা।"

নাইডু। তবে এখানে বসলেন না কেন ?

আমি। ওখানেই ভাল আছেন, এখানে গরম।

নাইডু তবু নিঃসংশয় হন না, চুপি চুপি আবার বলেন, "আমি তোমার কাছে বসেছি বলে রাগ করে নি তো ?"

আমি। না, তুমিও মা, তিনিও মা।

সুকৃতা চটিতে বাস দাঁড়ালে নাইডু উঠে গিয়ে আবার বুড়োমাকে এখানে বসার অনুরোধ করেন। কিন্তু মা বললেন, "তুমিই বস গে। এই ভিড় ঠেলে যাবে কে ?"

নাইডু নিঃশব্দে চলে এসে বসেন, মুখখানা ভার। মা যে আর এখন উঠে আসবেন না জানতাম, তাই চুপ করে থাকি।

যাত্রী ও মালে গাড়ি বোঝাই। হর্ন বাজল মোটরের। নাইডু এবার সজলদৃষ্টিতে মিনতির সুরে বলেন, "মাঈজী, আম্মা বহুৎ গোস্‌সা হুয়া, হামকো বহুৎ ডর লাগতা, তুম্ উন্‌কো বোলা লো।"

নাইডুকে আশ্বাস দিয়ে বলি, "আপনি ভাববেন না, ও কিছু নয়, আমি ডেকে আনব'খন।"

নাইডু আমার একটি হাত ওঁর হাতের মধ্যে নিয়ে

উদাসদৃষ্টিতে চুপ করে চেয়ে থাকেন বাইরের দিকে। হয়তো বা এই তুচ্ছতার উর্ধ্বে মনের স্থিতি খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন।

পার্বত্য পথ। ঘূর্ণি হাওয়ার মত পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে গাড়ি ছুটে চলেছে পূর্ণবেগে। দূরের দিকে তাকিয়ে দেখা যায় গাছপালা, আকাশ পাহাড়ও যেন ঝড়ের বেগে উধাও হয়ে ছুটে চলেছে আপন মনে। পথের একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে স্বর্গগঙ্গা অলকানন্দা। যত দেখি এই শিখর ও সরিৎ-এর শোভা, ততই অভিনব মনে হয়।

বেলা প্রায় পাঁচটায় পৌঁছলাম রুদ্রপ্রয়াগ। গাড়িতে গরমে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। এখানেও নাকি প্রচণ্ড গরম ছিল একটু আগে। কিন্তু আমরা রুদ্রপ্রয়াগ পৌঁছতেই নামল ঘনঘটায় বৃষ্টি। পাহাড়ী-বৃষ্টি—টিপটিপ নয়, একেবারে ঝমঝম করে। বড় বড় জলের ফোঁটায় ভিজে গেল শরীর। যে যার হুড়দাড় করে নেমে ঢুকে পড়ল দোকানপাটে। বাস-স্ট্যাণ্ডের পাশেই দোকানপাট। আমরা উঠলাম কাছের একটা চায়ের স্টলে।

দোতলায় একটা ঘর খালি ছিল। সেখানে গিয়ে কাপড়-জামাগুলো বদলে নিই। রাত্রির মত এখানেই থাকার ব্যবস্থা করে দিল ওরা। দোকানী নিয়ে আসে চা দুধ বিস্কুট। রাত্রির খাবারও ওরাই তৈরীর অর্ডার নেয়—বারো আনা প্রতি ডিস। নন্দলালের জন্য ফুলকার অর্ডার দেওয়া হল, পুরি ওরা তেমন পছন্দ করে না। ফুলকা মানে আকাবে বড় ও ভারী রুটি—যার একখানাতেই আমাদের পেট ভরে যায়। এমনি সাত আটখানা রুটি ওরা অবাধে খেয়ে নেয়। তা নইলে অত শক্তিই বা পাবে কী করে? ওই দুর্গম পথে শুধু হাতে শুধু পায়ে যেতেই যেখানে আমরা শ্রান্তিতে ভেঙে পড়ি,

ওরা কিনা সেখানে এক দেড় মণ বোঝা অবাধে বয়ে নিয়ে যায়!

রাত হয়ে গেছে অনেকটা। বাইরে তখনও অঝোরে জল ঝরছে। ঠাণ্ডা হাওয়া লুটোপুটি খাচ্ছে পাহাড়ের গায়ে, গাছপালায়। এবারে বেশ শীত শীত লাগছে। সবাই গরম কাপড় গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

আমি শুনছি বসে বৃষ্টির ঝরঝরাণি গান, বাতাসের শন-শনানি স্বর। থেমে গেছে ঝড়ের তাণ্ডব। ভিজে হাওয়ায় ভেসে আসে দূরের রিমঝিম রিমঝিম ধ্বনি। রুদ্রেশ্বরের আরতি সমাপ্ত হয়ে গেল।

আকাশ ও পাহাড় জুড়ে স্তব্ধ হয়ে আছে থমথমে অন্ধকার। মাতাল হাওয়া তখনও যেন শিখর থেকে শিখরান্তরে কাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। এমনি স্নিগ্ধ নবঘন বরষায় মানুষের স্পর্শকাতর চিত্ত কী এক অব্যক্ত বেদনায় আকুল হয়ে ওঠে। চায় সে অকৃত্রিম একটু ভালবাসার ছোঁয়া, যা রাঙিয়ে দেবে তার মনকে অনির্বচনীয় আনন্দ ও মাধুর্য রসে। যাতে থাকবে না দৈহিক ক্লিন্ন কামনাবিকার।

"প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই অনন্ত ও সান্তের দুটি অংশ আছে। অনন্তকে লাভ করা সুকঠিন। সে চিরদিনই সাধনার ধন। সাংসারিক বাসনা-কামনার উর্ধ্বে তার স্থান। অপরটি সংসারধূলিলিপ্ত প্রতিদিনকার মানুষ। সুতরাং মানুষে মানুষে সংসারের যে মিলন তা অপূর্ণ আধখানা মিলন।"

কেউ কারও সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিলতে পারে না। এই অনন্ত ও সান্তের ব্যবধানেই মানুষের নিঃসঙ্গ বিরহী অন্তর চিরকাল ধরে আপনার মধ্যে আপনি গুমরে মরে। মনের মানুষ খুঁজে পায় না কেউ সংসারে! একে বোঝে না

অপরের মন। না-বলা ব্যথায় জীবন ভারী হয়ে ওঠে। ইহাই বিরহী আত্মার নিজের বেষ্টনী থেকে মুক্তির ব্যাকুলতা, ইহাই অনন্তের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য গণ্ডীবদ্ধ প্রাণের নিরন্তর ক্রন্দন! গভীর প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে সে দিনের পর দিন। কবে তার বন্ধ কারার দ্বার হবে উন্মুক্ত! কবে আসবে তার সকল দুঃখহরা মরমিয়া জন!

'বঁধু যেদিন আসবে আমার দ্বারে
নিবিড় সুখে বাহুর মাঝে জড়িয়ে ধরে তারে
বলব তারি কানে কানে ওগো আমার বঁধু!
এতদিন যে তোমার লাগি পথ চেয়েছি শুধু॥'

রাত গভীর। বৃষ্টি থেমে গেছে। শোনা যায় অলকানন্দার নিরবচ্ছিন্ন কলধ্বনি। এবারে শুয়ে পড়ি। খাতা রেখে দিই শিয়রের পাশে।

আকাশ মেঘে ভার। সূর্যদেব দেখা দেবেন কি না ঠিক নেই।

বুড়োমা খুব ভোরে ওঠেন। আমি উঠে নীচে নামতেই দেখি তিনি মুখ ধুচ্ছেন। আমাকে দেখে একমুখ হেসে বললেন, "মায়ের ঘুম ভাঙল? কাল যা বৃষ্টি, এক ঘুমেই রাত কাবার। উঠে দেখি ভোর হয়ে গেছে।"

আমি। হ্যাঁ, ঠাণ্ডা বাতাসে বেশ আরামেই কাল ঘুমিয়েছি। ভোরের বাস কটায় ছাড়বে?

বুড়োমা। সাড়ে সাতটায়। ওরা ওঠে নি? তাড়াতাড়ি চল মা। ওদের ডাকি, সঙ্গমের স্নানটা সেরে আসতে হবে। ওই যে বাবা ও মিতাই নেমে আসছেন। বলে এক অঞ্জলি জল মুখে দিলেন।

আমি। কিন্তু আমার পক্ষে অতটা হাঁটা আজ সম্ভব নয় মা।

কুলকুচোর জলটা মুখ থেকে ফেলে দিয়ে বলেন, "অ্যাঁ, সঙ্গমে যাবে না তুমি ? কেন ? কি হয়েছে ?"

আমি। কাল বাসের ঝাঁকুনিতে কার একটা বাক্স এসে আমার পায়ে পড়েছিল—বড় ব্যথা হয়ে আছে।

বুড়োমা। দেখি দেখি, কোথায় লেগেছে ? আহা, এ যে নীল হয়ে আছে গো ! কী গেরো ! তীর্থ করতে চলেছিস অত বাক্স-ডেক্স কেন বাপু ? একি সংসার বাঁধতে যাওয়া ?

উনি দাঁত মাজতে মাজতে বললেন, "সঙ্গমে যাবেন তো মা ?"

আগের কথার পুনরাবৃত্তি করে মা বলেন, "যাব কি ! বাক্সটা যদি তেমন জোরে লাগত—হাড়ভাঙা বিচিত্র ছিল না, নেহাৎ বদ্রীনাথের দয়া। কোথায় এক সঙ্গে যাব তা নয়—কী গেরো বলুন ? তা কাল বল নি কেন মা ? একটু তেলপড়া লাগিয়ে দিলে দেখতে ওর গুণ !"

উনি। এ আজ বিশ্রামেই সেরে যাবে।

আমি। আমার জন্যে ভাববার কিছু নেই মা। আপনারা নাইতে চলে যান। আমি বরং নন্দকে নিয়ে জিনিস গুছিয়ে ফেলি।

"তবে তাই কর। আমরা তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে আসি।" মা এবারে একটু নিশ্চিন্ত হয়ে নাইডুকে বলেন, "চল মিতাই, নেয়ে আসি।"

এতক্ষণ নাইডু আমাদের কথাবার্তা শুনছিলেন এবং আমার ব্যথার কথা তিনি জানেন। গাড়িতে দুজনে পাশাপাশি বসেছিলাম। ম্লানদৃষ্টিতে বলেন, "তুমি যাবে না ?"

ব্যথার জায়গাটা দেখিয়ে বলি, "এজন্য পারব না।" তিনি হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বলেন, "তবে আমিও যাব না।"

নাইডুর এই ইশারা বুড়োমার দৃষ্টি এড়ায় নি, বললেন, "আবার হাত নেড়ে কি ইশারা হচ্ছে?"

বলার ভঙ্গিতে নাইডু কথার খানিকটা আঁচ করে নিয়ে বললেন, "আম্মা, ম্যায় বোলা কি আপ বাবাকো সাথ গঙ্গা-জীমে নাহান কর্ লিজিয়ে। হম মাইজীকো সাথ রহুঁঙ্গি।"

কথাটা বুড়োমার মোটেই মনঃপূত হয় নি। আমি না গেলেও ওঁরা সমবয়সী—একত্রে গেলে ভাল হত। কিন্তু বুড়োমার বাংলা কথার সঠিক অর্থ উনি সব বুঝতেন না। অথচ বলার সতেজ ভাবভঙ্গি নাইডুর মনে একটা ভীরুভাব এনে দিত। একা বুড়োমার কাছে থাকা বা কোথাও যাওয়া ওঁর পক্ষে ভারি অস্বস্তিকর ছিল। তাই আমাকে ছেড়ে একা যেতে চাইতেন না। কথাও বলেন খুব কম, চুপ করেই থাকেন বেশী। বুড়োমা কথা বলেন প্রচুর। একজন স্রোতস্বতী, অন্যজন ফল্গু।

নাইডুর কথায় ভ্রূ কুঞ্চিত হল বুড়োমার। বললেন, "হুঁঃ, মাকে ছেড়ে উনি যাবেন না। ওই যে বলে মার পোড়ে না, পোড়ে মাসীর—কী আমার দরদী লো! মায়ের যাওয়া হল না, রুদ্রেশ্বরকে দেখা হল না। মনটা খচখচ করছে। কত পুণ্যে এসব স্থানে যাওয়া ভাগ্যে ঘটে—তা ওনার হয়েছেটা কী?" পরে ওঁর দিকে ঘুরে বললেন, "যাকগে। চলুন বাবা চলুন। মিছিমিছি সময় নষ্ট।" বলে কাপড় ও কমণ্ডলু নিয়ে ওঁরা দুজন স্নানে চলে যান। আমরাও পাইপে স্নান সেরে ওপরে উঠি।

সাড়ে সাতটায় বাস ছাড়বে। নন্দকে নিয়ে বিছানাপত্র বেঁধে আমরা নীচে চলে যাই। ওঁরা যখন স্নান করে ফিরলেন, বাস প্রায় ছাড়ে ছাড়ে। তাড়াতাড়ি করে সবাই উঠে

কোনমতে জায়গা নিয়ে বসি। ভিড় হয়েছে। বাসের পাশেই দোকান। দুধ চা বিস্কুট দিয়ে যায় দোকানী জানালা দিয়ে।

এবারেও বুড়োমা আমাদের কাছ থেকে দূরে বসলেন। মনটা ভারাক্রান্ত লাগে—সহজ বিষয়ে কেন এমন জট পাকায়? কী করে এই দ্বিধারাকে একত্রিত করা যায় বসে বসে ভাবি।

পেরিয়ে চলি কর্ণপ্রয়াগ। এখানে পিণ্ডরগঙ্গা ও অলকানন্দা সঙ্গমে পর্বতসানুদেশে কর্ণ সূর্যদেবের তপস্যা করেছিলেন। এসে যায় নন্দপ্রয়াগ। অতি অল্পসময় গাড়ি থামে এখানে। চামৌলীতে গাড়ি দাঁড়ায় কিছুক্ষণ। এখান থেকেই কেদার-ফেরত যাত্রীরা বদ্রীনাথের বাস ধরে।

যাত্রীরা অনেকেই নামল। আমরাও নেমে বুড়োমাকে ধরি। বলি, "চলুন মা, এখানে কি পাওয়া যায় দেখি। বাঃ, এখানকার গঙ্গা তো বেশ কাছে এসে গেছে! কী সুন্দর।"

তিনজনেই গঙ্গার দিকে ঘুরে একটা দোকানে যাই। কিছু মিষ্টি কিনে নিই। বাসের কাছে যেতে যেতে বুড়োমাকে বলি, "এবারে আমাদের দিকে বসবেন মা।"

আবার সেই নির্লিপ্তি: "বসাবসির কী আছে? গিয়ে পৌঁছতে পারলেই হল। ওখানেই বেশ আছি।"

"না না, ওখানে নয়, আমাদের এখানে।" বলতে বলতে প্রায় টেনে বুড়োমাকে আমাদের দিকে ওঠালাম।

এবারে মাঝখানে মা, একদিকে নাইডু, অন্যদিকে আমি। মিষ্টিগুলো হাতে দিয়ে বললাম, "নিন মা, আপনি দেবেন সবাইকে।"

একটু হেসে বলেন, "তা দাও, মায়ের কথা এড়ানো যায় কখনও?"

নাইডু মা .আমি আবার ধীরে ধীরে কথাবার্তায় সহজ হয়ে উঠি। উনি তখন ছেলেদের দিকে।

বেলা বারোটায় গাড়ি এসে থামল তার শেষ গন্তব্যস্থল পিপুলকুঠিতে। এখানে ডাক ও তারঘর, ডাকবাংলো, বড় একটি বাজার ও কুড়িটি চটি আছে। জলের কলে, দোকানে দোকানে যাত্রীর ভিড়, খাওয়াদাওয়া হৈ-হল্লার উল্লসিত ধুম। হাঁকডাক আনাগোনা কথাবার্তায় পথঘাট সরগরম। লাউড-স্পীকারে গান হচ্ছে টিকেটঘরের সামনে।

জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রেখে আমরা সবাই স্নান সেরে নিই। নন্দলাল বুড়োমায়ের রান্নার উনুন জল কাঠ সব যোগাড় করে দেয়। বুড়োমা ওঁকে বললেন, "আপনারা গিয়ে পাঞ্জাবী হোটেল থেকে খাওয়াদাওয়া সেরে আশুন। বেলা অনেক হয়ে গেছে।"

কাছেই পাঞ্জাবী হোটেল। আমরা যেতেই একটি আলাদা ঘরে টেবিলে আমাদের খাবার দেওয়া হল। এখানের ব্যবস্থা ভাল। মিহি চালের ভাত ডাল ছোলা ও আলুর ডালনা ও আচার। ভাল ঘিয়ের পুরিও ভাজা হচ্ছে, মিঠাই-মণ্ডাও আছে—যার যা অভিরুচি। রান্নাটা বেশ সুস্বাদু।

একটি পাঞ্জাবী ছেলে এসে জিজ্ঞেস করে, "'আউর চাউর চাহি?"

মুখ তুলে দেখি একথালা ভাত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। উনি বললেন, "নেহী, ঔর কুছ নেহী লাগেগা।" ওরা একবারেই যা দিয়েছে আমাদের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

আমরা ঘরে এসে দেখি বুড়োমার খাওয়াদাওয়াও শেষ। আমরা আসতেই নন্দলাল চলে যায় ওর পাহাড়ী বন্ধুদের সঙ্গে খাবার খেতে। সবাই বাসের ঝাঁকুনি-ক্লান্ত

দেহগুলোকে এলিয়ে দিই বিছানায়। বাস ধরার তাড়া আর নেই। আগামীকাল থেকে শুরু হবে পায়ে-হাঁটা পথ।

ধর্মশালায় দলে দলে আসছে কেদার-ফেরত যাত্রীদল। আসছে সাধুসন্ন্যাসীগণ বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে।

সন্ধ্যা হয়ে এল। দোকানগুলোতে আলো জ্বলে উঠল সারি সারি। পাহাড়ের ঝোপেঝাড়ে অন্ধকার জমে উঠতে লাগল। লাউডস্পীকারে তখনও গান হচ্ছে—

"ওগো তোরা কে যাবি পারে
আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী কিনারে।"

নিবিড় অরণ্যানীর ওপার থেকে ভেসে আসে যেন আনন্দ-লোকের আহ্বান। পারের কাণ্ডারী নিয়তই ডাকছেন, 'ওরে আয় বেলা যায়।' এ ডাক মানুষের মনের তটে ভেসে ভেসে ফেরে, আমল দেয় না মন। মায়ার হাতছানিতে ভুলে থাকে! যখন সে ঘোর কাটে তখনই সে মন হয় উদ্‌ভ্রান্ত। 'ওই বাঁশী বাজে বনমাঝে কি মনমাঝে।' চলে জীবনভোর খোঁজাখুজির পালা।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। আমরা যেখানটায় রয়েছি তার একটু দূরেই একটি সাধুকে ঘিরে কয়েকজনের চলছে ধর্মালোচনা। কথাশেষে সাধুজী মন্তব্য করলেন, "ইয়ে ছুনিয়াদারী বড়ী ঝক্‌মারি হ্যায়। ইসেসে মহাজনয়োঁ কো বাত—এ সন্‌সার ঝুট হ্যায় মনুয়া রামনাম কর সার।"

মনে পড়ে বিগত দিনের কথা। বাবা ছিলেন পরম-ভাগবত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ি আসর বসত ভাগবত ধর্ম আলোচনার। বাবা নিজেই শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণকথামৃত বর্ণনা করতেন। বহুদূর থেকে অনেক গুণী-জ্ঞানীজন একত্রিত হতেন এই সভায়।

আমিও চুপি চুপি একটি কোণে বসে থাকতাম। কী যে ভাল লাগত বাবার মুখের সেই অমৃতময় বাণী। বাস্তব জগৎ থেকে আমার শিশুচিত্ত বেড়িয়ে বেড়াত এক অজানা কল্পলোকে। কিন্তু নিয়তির নির্দেশে কৈশোরেই নির্বাসিত হই সে জগৎ থেকে। বৈষ্ণবের মেয়ে হল শাক্তকুলের বধূ। কাজেই আগের রীতিনীতি গতিবিধি গেল পালটে। যেন একটা নির্মম ঘূর্ণিবায়ু ভেঙে দিয়ে গেল পুষ্পিত ডালটিকে। এই দ্বিধারাবাহী মতের অনৈক্যে 'না ঘাটকা না ঘরকা' হয়ে রইল মনটা। যাক, সে সব কথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু এখনও সাধুসন্ন্যাসী দেখলে বা কোথাও ধর্মালোচনা শুনলেই সেই ঘুমন্ত মনটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। বলে, আমি জেগে আছি। আজও সে লোকচক্ষুর অন্তরালে উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসেছে : 'এ সন্‌সার ঝুটি হ্যায়, মনুয়া রামনাম কর সার।' মনের মূলে আঘাত করে সেই সুর। বাইরের আমিকে ভিতরের আমি ধাক্কা মেরে সজাগ করে দেয়।

ওই লোকগুলো চলে যেতেই সাধুজীর কাছে গিয়ে অসঙ্কোচে বলি, "সাধুবাবা, কৃপা করকে মুঝে ধরমকী বাত বাতাইয়ে।"

মৃদু হেসে সাধুজী বললেন, "যদি কিছু জানবার থাকে মা জিজ্ঞেস কর। যা জানি বলব।"

অবাক হলাম। পরিষ্কার বাংলা উচ্চারণ। মনে আসে স্বস্তি। যা হোক, মন খুলে কথা বলা ও শোনা যাবে। হিন্দী যা জানি কোনমতে কাজ চালানো আর কি। কিন্তু হিন্দুস্থানীদের যখন অনর্গল হিন্দীভাষণ চলে তখন ভাল হিন্দী জানা না থাকলে তা বড়ই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে।

জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা, সংসারে আমরা নিরন্তর দুঃখভোগ

করেও কেন মনে মুক্তির বাসনা আসে না? যা থেকে দুঃখ পাই, কেন তাকেই আঁকড়ে ধরে কাঁদি?"

"উত্তম প্রশ্ন। মায়ার ওই জাদুতেই দুনিয়া মশগুল হয়ে আছে মা। মানুষের দুঃখের মূলে বাসনা। এখানে এক বাসনা পূর্ণ হলে মনের মধ্যে লক্ষ বাসনা উদ্দণ্ড নৃত্য জুড়ে দেয়। মানুষ সুখ বলে যাকে ভাবে, অতি ক্ষণিক তার স্থিতি। সুতরাং এই স্থায়িত্ববিহীন জগতে শুধু লাভ হয় অপূর্ণতার দুঃখ। ওই যে রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন—'যাহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই আপনার মন ভুলাতে, শেষে দেখি হায় ভেঙে সব যায় ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে।' তবু কাটে না মানুষের ভ্রান্তি, সেই মরীচিকার পেছনেই ঘোরে মন। ভাবে যদি বা কিছু সুখের সন্ধান পাই—তাই বাসনার বন্যায় অবশ হয়ে ভেসে চলে মানুষ। যা ভেঙে যায় আবার তা নূতন করে গড়তে বসে। 'গণ্ডীবদ্ধ অন্ধ এ মন আমার আমার করে, ভুলি আপনারে দুখের পাথারে কেবলি ডুবিয়া মরে।' এই মায়া বড় ভয়ঙ্কর। মায়া থেকেই বাসনার জালে জড়িয়ে পড়ে মন। সকল দুঃখের মূলে মায়া জেনেও তাকে ত্যাগ করা বড় কঠিন।"

একজন প্রশ্ন করলেন, "এই মায়ার স্বরূপ কি?"

সাধুজী বললেন, "একদিন নারদমুনিও শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা বলেছিলেন—'প্রভো, তোমার মায়ার স্বরূপ আমায় দেখাও।' তাঁরা বনপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, 'বড্ড তেষ্টা পেয়েছে নারদ, আগে আমাকে একটু জল খাওয়াও, পরে বলছি।' নারদ বললেন, 'তবে তুমি এখানে একটু বস, আমি তোমার জন্য জল নিয়ে আসছি?' কিন্তু বনের মধ্যে কোথায় পাবেন জল? তিনি এগিয়ে গ্রামের দিকে

চললেন। একটি বদ্ধ কুটিরের দোরে ঘা দিতেই একটি তরুণী এসে দরজা খুলে দিলে। নারদমুনিকে দেখে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে বললে, 'আপনি একটু বসুন, বাবা বাইরে গেছেন, এক্ষুণি আসবেন।' মেয়েটির কথাবার্তা ও ব্যবহারে নারদমুনির খুব ভাল লাগল। এমন কি মেয়েটির পিতার অনুরোধে কদিন ওখানে থাকতে রাজীও হলেন। একদিন তিনি মেয়েটিকে বিবাহের প্রস্তাবও করলেন। মেয়ের পিতা নারদমুনিকে কন্যাদান মহাভাগ্য ভেবে মেয়ের বিয়ে দিলেন। এইভাবে নারদের দ্বাদশ বৎসর কেটে যায়। একদিন গাঁয়ে ভীষণ বন্যা এল। নারদ এক হাতে স্ত্রী অন্য হাতে দুটি পুত্রকে ধরে নিয়ে নদী পার হতে গেলেন। একটা প্রচণ্ড ঢেউয়ে তারা নারদের হাত থেকে ছিটকে নদীতে তলিয়ে গেল। নারদ তখন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদতে লাগলেন। এমন সময় শুনতে পেলেন কানের কাছে কে যেন বলছে, 'নারদ আমার জল কই?' মানুষ ঠিক এমনি মায়ার ফাঁদে ভুলে যায় আত্মস্বরূপ। কিসের খোঁজে বেরিয়ে কি নিয়ে ভুলে বসে থাকে। একেই বলে দুনিয়াদারী। একেই বলে মায়ার ঘোর। পঞ্চভূতের ফাঁদে পা দিয়ে এ থেকে নিস্তার পাওয়া বড় শক্ত।"

জিজ্ঞেস করি, "যে মায়া আত্মজ্ঞান থেকে আমাদের ভুলিয়ে রাখে তা থেকে মুক্তির সহজ উপায় কি?"

"অনায়াসলব্ধ বস্তু তো সে নয় মা! মনে যদি সত্যলাভের বাসনা সত্যি করে জেগে থাকে তবে অটুট দৃঢ়তায় তাকে ধরে রাখতে হবে। সাংসারিক নানা বাধাবিঘ্ন লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিতে চাইবে মনকে। মানুষ কত না দুঃখকষ্ট ভোগ করে একটু ক্ষণিক সুখের জন্য, কিন্তু পরমার্থ লাভের জন্য করে কতটুকু

ত্যাগস্বীকার? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বর্তমান ভোগবাদী বিশ্বে মানুষের এমনি ভাবধারা যে কেউ যদি এসে বলে, এস তোমাদের আজ এমন বিষয় শিক্ষা দেব যাতে তোমরা জীবনের চরমলক্ষ্য পরমজ্ঞান লাভে সমর্থ হবে।' অমনি দেখা যায় মানুষ নিরুত্তর ও নিরুৎসাহ। কিন্তু যদি বলা যায় 'এস তোমাদের এমন এক বিষয় শিক্ষা দেব যাতে ইন্দ্রিয়সুখ অনন্তগুণ বাড়বে'—অমনি হাজার হাজার লোক সেই দিকে ছুটবে। প্রেয়ের প্রলোভনে মানুষ এমনি করেই শ্রেয়কে হারিয়ে ফেলে। সত্যজ্ঞান লাভের ইচ্ছা মনে থাকলে স্বামিজীর বাণী সর্বক্ষণ স্মরণে রাখতে হবে। জীবনে যত বিঘ্ন-বিপদই আসুক না কেন অটুট দৃঢ়তায় এগিয়ে চলতে হবে সামনের দিকে। উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—চলতে থাক যতদিন না ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান পাও। তারই জন্য চাই নীরব সাধনা। এই হিমালয়কে যারা ভালবাসতে জানে, হিমগিরির হিমস্পর্শে জুড়িয়ে দেয় তাদের ঐহিক বিষয়ের জ্বালা, দূর করে দেয় অর্থ যশ মানের মোহ, ঘুচিয়ে দেয় ইন্দ্রিয়বিকারগ্রস্ত মনের সকল সন্তাপ। তাই সাধনার্থীগণ আশ্রয় নেয় এই অমৃততীর্থের শিলাকক্ষতলে। মানব-মনের গভীরে যে সুধাভাণ্ড অক্ষয় হয়ে আছে তাকে লাভ করার জন্য চাই অমিত আকাঙ্ক্ষা। এবং মন যখন একবার সে সন্ধান পায় তখন সে আর মায়ার গোলকে ধরা দেয় না। নদীর গতি ততক্ষণ যতক্ষণ না সে সিন্ধুতে আত্মসমর্পণ করতে পারে। সাধনার দ্বারা ব্যক্তিজীবন যখন বিশ্বজীবনে মিলিত হয় তখনই মন হয় ভূমানন্দময়। জাগতিক দুঃখের ঘটে বিরতি। মন তখন সেই আনন্দসিন্ধুতে সন্তরণ করে বেড়ায়।

সাধুজী গুনগুনিয়ে একটি গান ধরলেন—

'আমার এ বাঁধনহারা পাগল পরাণ রাঙিয়ে দিল কে !
কোন্ মায়াবীর সুরের মায়ায় অরূপ আলোকে।
ঘরছাড়া মন যে ধন আশে
ঘুরে বেড়ায় পথের পাশে
বুঝি, তারই ছোঁয়া লাগলো আজি অন্তরলোকে।
আমার এ বাঁধনহারা······
শূন্য কাননবীথি আমার ভরলো ফুলে ফুলে
এ কী বন্যা এলো রে আজ প্রাণ-যমুনার কূলে।
আজি, তাঁরই পরশ অন্তরময়
বিশ্বভুবন তাই মধুময়
উদাস হিয়ায় লাগলো কী ঢেউ বিপুল পুলকে।
আমার এ বাঁধনহারা ·····'

গান থেমে যায়। মনের উপকূলে ভেসে ফেরে সেই বাউল সুরের ঢেউ। নিয়ে যেতে চায় মনকে সুদূর অজানায়।

"আর কোন প্রশ্ন আছে কি ?" জিজ্ঞাসা করেন সাধুজী।

অতীন্দ্রিয় লোক হতে ফিরে আসে মন। প্রশ্ন করি, "গৃহী যারা, তাদের পক্ষে বনে গিয়ে তপস্যা করা দুঃসাধ্য, তা ছাড়া সংসারের প্রতিও কর্তব্য রয়েছে মানুষের।"

সাধুজী বললেন, "সে সব ক্ষুদ্র কর্তব্য মা। তার চাইতেও বড় কর্তব্য সেই পরমসত্যকে জানা। নিজের ভিতর যে পরমপ্রিয় পরমাত্মা রয়েছেন তাঁকে একান্ত করে অনুভব করা। ভক্ত বাউল গেয়েছেন, 'মনের মানুষ মনের মাঝে করো অন্বেষণ।' এ 'অন্বেষণ' তো বাইরের খোঁজা নয়, অন্তরের অতল থেকে আহরণ করতে হয় নীরব সাধনায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলেছেন, 'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন।' এই রূপ-

সাগরে ডুব দেবার জন্যই মন হয় নীরব স্থানের প্রয়াসী। মনকে মন্থন না করলে তো সে অমৃত লাভ করা যায় না। আত্মমগ্ন মানুষ যখন সেই সচ্চিদানন্দঘন সাগরে ডুব দেয় তখনই সে দেখতে পায়—যিনি সকলের আমি, তিনি আমারও আমি। এই একাত্মতায়ই অনুভূত হয় বিশ্বপ্রীতি—বসুধা হয় কুটুম্ব। পৃথিবীতে যাঁরা মহাপ্রাণ, বিশ্বশান্তিবিধানের অপার করুণায় ভরে ওঠে তাঁদের বুক। তাই অনন্তপ্রেমের উপাসক বুদ্ধ যীশু চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ধূলার ধরণী হয়ে উঠেছিল করুণাঘন কমনীয়। আত্মপ্রত্যয়ের জন্য কত না দুঃখকষ্ট সহ্য করে দিনের পর দিন কেটে যায় সাধুসন্ন্যাসী-দের। কঠিন দুঃখ ও আত্মবিলোপের পথেই মানুষ লাভ করে ভগবানের প্রেমময় স্পর্শ। প্রেয়ের প্রলোভনে শ্রেয়ের পথ হারিয়ে ফেললে সঠিক পথের সন্ধান তো মেলে না। মানুষ যখন সর্বস্ব ওই চরণে সঁপে দিতে পারে তখনই সেই সর্বহারা মনের মাঝে ধরা দেন সর্বেশ্বর। তাই তো বলি মা, এ সন্‌সার ঝুটি হ্যায়, মনুয়া রাম নাম কর সার।” এই বলে সাধুজী নীরব হলেন।

আমরাও সাধুবাবাকে প্রণাম করে উঠে পড়ি। ধীরে ধীরে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেল। রাত হয়েছে, বেশ শীত লাগছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে আমরাও শুয়ে পড়ি।

দ্বিতীয়ার চাঁদ কখন অস্ত গেছে। পাহাড়ের মাথায় তারাভরা কালো আকাশ ঝিকমিক করছে। মনের সঙ্গে চলে নানা কথার বোঝাপড়া। সর্বস্ব সমর্পণের জায়গায় কতটুকু ছাড়তে পারিস মন? শ্যাম রাখি কি কুল রাখি—এ দ্বন্দ্বে তো সিদ্ধি ঘটে না; শ্যামকে রাখতে হলে কুলের মায়া ছাড়তে হয় যে। সেই সত্যজ্ঞান লাভের তৃষ্ণা যখন প্রবল

হয়, বহিরিন্দ্রিয়ের কোন আকর্ষণ তাকে আর ধরে রাখতে পারে না। এরই তাগিদে একদিন বুদ্ধদেব অপরিসীম পিতৃস্নেহ, অফুরন্ত পত্নীপ্রেম ও অতুল ঐশ্বর্যের প্রলোভন ত্যাগ করে হয়েছিলেন নীরব সাধনার প্রত্যাশী। হাজার বই পড়, উপদেশ শোন—মনের মণিদীপটি যদি না জ্বালানো যায়, অন্ধকার ঘুচবে কী করে? তাই তো কুমার সুধাকর বলেছেন—

'ঘরে ঘরে গীতাপাঠ ফল কেন ফলছে না,
দেশলাইয়ের কাঠির দোষে একটি কাঠিও জ্বলছে না।'

জড়বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন মনও তেমনি ভিজে বারুদের মত অকেজো হয়ে পড়ে। জ্ঞানলাভ করতে না পেরে মায়ার গোলোকে দিশেহারা হয়ে ঘুরতে থাকে। তাই—

'বিচিত্র এ ধরণীর বর্ণ গন্ধ গানে
ধাইছে বিমুগ্ধ নর তৃষাদীর্ণ প্রাণে
যুগ হতে যুগান্তর পারে।
ব্যথিত বিক্ষুব্ধ চিত্ত
জর্জরিত হয়ে মরে কামনার ভারে।
হায় এ যে আলেয়ার ফুল
হারায় পথের দিশা আনে মহাভুল।
এই ভ্রান্তি রহে যতক্ষণ
চিত্তে চলে অবিরাম অশান্ত ক্রন্দন।'

মেরুপথে

॥ ৯

আজ অক্ষয় তৃতীয়া। শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যাভিষেক ও চন্দনযাত্রা। তখনও ভোরের আলো ভাল করে ফোটে নি। পাহাড়ের

ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে আছে অন্ধকার। স্বচ্ছ হয়ে উঠছে পূর্বাকাশ একটু একটু করে।

দলে দলে হাঁটাপথে চলেছে যাত্রীগণ—পিপুলকুঠি থেকে পাষাণপুরী পরিক্রমায়। 'জয় বাবা বদ্রীবিশালা কি জয়' ধ্বনিতে নৈশগগন মুখরিত করে।

সেই পরম কর্ণধারকে নমস্কার করে আমরাও যাবার জন্য প্রস্তুত। রওনার পূর্বে দেখি হরিদ্বার থেকে বদ্রীনাথের জন্য যে ফলগুলি এনেছিলাম, এই চারদিনের গরমে ও ঝাঁকুনিতে বেশ নরম হয়ে এসেছে তার কতকগুলি। হাঁটাপথে আরও কদিন যে লাগবে জানি না, তাতে হয়তো নষ্টই হবে ভেবে ওই ফল থেকে কিছু ফল এক সন্ন্যাসিনীকে দিই।

গতকাল সন্ধ্যায় এই নবীন সন্ন্যাসিনী এসেছেন ধর্মশালায়। কেদার ঘুরে চলেছেন বদ্রীনাথের পথে। আমাদের দিকটাতেই শুয়েছিলেন। আসার অল্প পরেই শ্রান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। রাত্রিতে অভুক্ত সন্ন্যাসিনীকে ডেকে কিছু খাওয়াবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কয়েকবার ডেকেও সাড়া পাই নি। অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন।

তাই যাবার পূর্বে সন্ন্যাসিনীর হাতে ফল কটি দিয়ে বললাম, "মাঈজী, থোরী সে ফল লে লিজিয়ে। শ্রীশ্রীবদ্রীনাথজীকি পূজাকে লিয়ে ইয়ে ফল লে কর চলি থী। রাস্তেমেঁ খারাপ হো যায়েঙ্গে, ইস্ লিয়ে আপ কী সেবামেঁ লগ্ যায় তো আচ্ছা।"

শান্ত মধুর কণ্ঠে সন্ন্যাসিনী উত্তর দেন, "আজ অক্‌সয় তৃতীয়া, তুমহারী দান শ্রীশ্রীবদ্রীবিশালজীনে গ্রহণ কিয়া। ভগবান তুমহারা মঙ্গল করে, তুমহারী যাত্রা সফল হো।" হাত পেতে ফলগুলি নিয়ে আবার বললেন, "আউর দেখিয়ে

মাতাজী, গড়ুরগঙ্গামে এক ডুবকী লগা কর এক পত্থর উঠাইয়ে, উসকী পূজন সে সাঁপ কী ভয় নহীঁ রহতা।”

সন্ন্যাসিনীর নাম বসন্ত্‌পুরী। বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে। উজ্জ্বলবর্ণ। এই যৌবনে যোগিনী আজ জীবনের প্রেয়কে পেছনে ফেলে সেই পরমসত্যের অন্বেষণে চলেছেন একা পথচারিণী।

যে পথে প্রতি বছর ছুটে চলেছে অর্থী প্রার্থী ও দর্শনার্থীগণ দলে দলে শীতাতপ জীবনমরণের ভয় তুচ্ছ করে, আমরাও সে পথের নিশানা ধরে ধীরে ধীরে পথ চলা শুরু করি।

ক্রমাগত চার মাইল পথ হাঁটার পর এলাম গড়ুরগঙ্গায়। বহুলোক সেখানে স্নান-দানাদি করছে। জল বেশী নয়, হাঁটুজল হবে। গঙ্গার উপর দিয়ে ব্রীজ। পাশেই গড়ুরজীর মন্দির। স্নান করে মন্দিরে সবাই প্রণাম করে। পাণ্ডা 'অকালং মৃত্যুহরণং সর্বব্যাধিবিনাশনম্‌' ইত্যাদি মন্ত্র পড়ে যাত্রীদের হাতে দেয় চরণামৃত, দেয় আশীর্বাদ।

দু পাশে দোকানপাট। চা ও খাবারের দোকানগুলিতে ভিড় জমে যায়। যে যার চা দুধ খাবার খেয়ে আবার আরম্ভ করে পথ চলা। পাহাড়ের গা বেয়ে নীরবে চলেছে অগুন্তি যাত্রীদল।

এক মাইল দু মাইল অন্তর অন্তরই চটি। দৈনিক তেরো মাইল হাঁটলে তিনদিনে যাওয়া যায় বদ্রীনাথ। কিন্তু আমাদের দলের অতটা হাঁটা সম্ভব নয়। চটিতে চটিতে বিশ্রাম করে যে কদিনে পৌঁছতে পারি।

টাংনী চটি। আমরা সোজা দোতলায় গিয়ে উঠলাম। রান্না খাওয়া বিশ্রাম ওই একটি ঘরের মধ্যে করতে হবে। আমাদের পাশের ঘরটাতে এসেছে একদল। দুটি ছেলে দুটি

মেয়ে। সবারই বয়স অল্প—তরুণ-তরুণী। ওরা চা খেয়ে তক্ষুণি আবার গোলাপচটি যাবার জন্যে প্রস্তুত।

একটি ছেলে ওঁকে বললে, "আপনারা গোলাপচটি যাবেন না এখন ?"

উনি জবাব দিলেন, "না, এবেলা বিশ্রাম নেব এখানেই।"

ওরা চারজন চলেছে চলার দুরন্ত আবেগে। আর আমরা চারজন চলেছি ধুঁকতে ধুঁকতে দিনের শেষের পূজায়।

দুপুরটা বিশ্রাম করে নিয়ে বেলা তিনটেয় আবার শুরু হয় পথ চলা। চলার তালে তালে মন বলে, 'আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ।' নেই মানা, নেই কোন বাধা, এগিয়ে চলেছি সমুখপানে আপনমনে। আবর্তের টানে নয়, আনন্দ-লোকের সন্ধানে। অজানাকে জানার অপরিসীম আগ্রহে।

এবারে পাতালগঙ্গা। পথ খুব খাড়া ও সরু। দূর থেকে দেখা যায় যেন একগাছি দড়ি দিয়ে পর্বতরাজকে কারা বেঁধে রেখেছে। পাতালগঙ্গা ছুটে চলেছে অনেক নীচু দিয়ে। উপর থেকে নীচের দিকে তাকিয়ে থাকলে মাথা ঘুরে যায়। কোন্ অতলে ফুলে ফুলে ঘুরে ঘুরে বেঁকে বেঁকে চলেছে জাহ্নবীর ফেনশুভ্র জলধারা। যেন আহত অনন্তনাগ সহস্র ফণা তুলে গভীর গর্জনে ছুটে চলেছে প্রচণ্ডবেগে—সোঁ সোঁ সোঁ।

সন্ধ্যায় এসে যাই গোলাপকোঠী। রাত্রিটা এখানেই থাকতে হবে। একটা দোকানের পাশের ঘরে যাত্রী থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা সে ঘরটাই নিলাম। কাছেই পাইপে প্রচুর জল পড়ছে। ঠাণ্ডা জলে সবাই হাত পা ধুয়ে ভাল করে গায়ে জামাকাপড় এঁটে বসি। বেশ ঠাণ্ডা লাগছে। দোকানী নিয়ে আসে গরম চা ও ফুলুরি।

যাত্রীর খুব বেশী ভিড় নেই এখানে। যারা দৈনিক বারো-তেরো মাইল হাঁটার হিসেবে চলবে তারা এগিয়ে যায় পরের চটিতে—কুমার কিংবা খনৌটিতে। তিনদিনে তারা পৌঁছবে বদ্রীনাথ।

ধীরে ধীরে গিরি-অন্তরালে ডুবে যায় দিবাকর। আকাশে একফালি বাঁকা চাঁদ শুক্লা তৃতীয়ার কথা জানিয়ে দিচ্ছিল। বুড়োমা জপে বসেছেন। নাইডু চুপ করে বসে আপন মনে। বুড়োমায়ের জপ সমাপনান্তে তিনি দোকান থেকে কি জিনিস কতটুকু লাগবে নন্দলালকে বলে দিলেন নিয়ে আসতে।

নাইডুকে একটি ভজনগান করার জন্য আমরা অনুরোধ করি সবাই। খুশী মনে তিনি মেনে নিলেন আমাদের অনুরোধ। আসন করে বসে যুক্তকরে প্রথম শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করলেন—

'কস্তুরী তিলকং ললাট-পটলে
বক্ষস্থলে কৌস্তুভং নাসাগ্রে গজমুক্তিকম্
করতলে বেণু, করে কঙ্কণম্।' ইত্যাদি

ধ্যানশেষে মীরাবাঈয়ের ভজন ধরলেন—

'ম্যায়নে চাকর রাখো জী।'

সমাপ্তিতে প্রণাম—

'মাতা চ কমলাদেবী পিতা দেবো জনার্দন
বান্ধবা বিষ্ণুভক্তানাম্ স্বদেশ ভুবনত্রয়ম্।'

গাইতে গাইতে নাইডুর চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে ফোঁটা ফোঁটা। শ্রদ্ধায় মন অভিভূত হয়। আরাধ্য দেবতার চরণে যে পারে এই অশ্রু-অর্ঘ্য নিবেদন করতে, সার্থক জীবন তারই।

রাজরাণী মীরাবাঈ ভিখারিণী হয়েছিলেন গিরিধারীলালের জন্য। 'তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনা ন কোঈ'—এই ছিল তাঁর মর্মবাণী। সর্বস্ব সমর্পণের আকুলতায় ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন তিনি। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল গিরিধারীলালের প্রেমে। তাই একদা সেই মহীয়সী রমণীর তনুমনপ্রাণ একীভূত হয়ে গিয়েছিল সেই পরমপ্রেমের পাথারে। নিজের মনে কতটুকু সেই আর্তি খুঁজে বেড়ায় মন? জীবনে যে প্রেয়তম, কাঁদি কি কখনও তার বিরহে? কাঁদি সংসার-ধাঁধায়, কাঁদি রিপুর তাপে তপ্ত হয়ে অশান্তির তাড়নায়। চাই সুখ, চাই শান্তি।

তৃতীয়ার চাঁদ ডুবে গেছে। নিবিড় বনান্তরাল হতে সন্ধ্যার তরল আঁধার ঘনিয়ে আসে। শিখর, বনভূমি, পথের নিশানা—সব অবলুপ্ত হয়ে যায়, পাহাড়ের বুকে জমে ওঠে থমথমে অন্ধকার।

রাত্রির সেই অকূল মোহানায় একাকী নিঃসঙ্গ মন ভেসে বেড়ায় চির-অজানার অভিসারে। সন্ধান মেলে না কিছুর। তোলপাড় করে শুধু মন।

পক্ষীশাবকের যখন নতুন ডানা বেরোয়, বারবার সে ডানা ঝাপ্‌টায় ওড়ার জন্য। অবশেষে যখন সমর্থ হয়, উধাও হয়ে ছোটে সে আকাশপথে। তেমনি মনপাখীও ডানা ঝাপটায় বারবার। সেই অন্তবিহীন অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া আজও তার হল না।

"মাঈজী"—কল্পলোক থেকে নেমে আসি বাস্তবে। তাকিয়ে দেখি নন্দলাল আমার দিকে সপ্রশ্নদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে। আমি ওর দিকে তাকাতেই বলল, "মাতাজী, আটা ঘিউ আলু, সভী চিজ লেয়ায়া, আভী পুরি বানায়েঙ্গে?"

নন্দলালকে বলি, "তুম্ সব উঁহা ঠিকসে রাখ্খো, হমলোগ আতে হ্যাঁয়।" বারান্দার একপাশেই উনুন। যেখানে চা তৈরী হয় সেখানটায় বসে আমি বুড়োমা নাইডু তিনজনেতে কথাবার্তা চলে, খাবারও তৈরী করতে থাকি। তরকারির পর পুরি ভেজে দিই। বুড়োমা সবাইকে খাবার পরিবেশন করলেন। দোকানী ছেলেটিকেও কিছু খাবার দিই। নাম ওর মঙ্গল সিং। অল্প বয়স, বছর কুড়ি হবে। বড় সরল ভাব।

ওর দোকানের একপাশে একটা বড় কাঠের সিন্দুকে জিনিসপত্র গোছগাছ করে রেখে ওরই ওপর প্রতিদিন ও ঘুমোয়। আজ নন্দলালকে ওর জায়গায় শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে ও চলে গেল এক পরিচিত দোকানে ঘুমুতে। যে ঘরটায় আমরা রয়েছি সে ঘরটা অত্যন্ত ছোট। তাই মঙ্গল সিং নিজেই নন্দলালের জন্য জায়গা ছেড়ে দিল। বড় সরল বিশ্বাসী এই গাড়োয়ালবাসীরা। গোটা দোকানের ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চলে গেল সে অন্য জায়গায়।

নন্দলাল ও ওর মধ্যে চলেছে নেপালরাজ্যের খবরাখবর আলোচনা। কবে ও ঘর ছেড়ে এদিকে এসেছে, লেখাপড়া কিছু শিখেছে কিনা, ঘরে কে কে আছে ইত্যাদি ব্যক্তিগত প্রশ্নও জিজ্ঞাসাবাদ করেন উনি। অবশেষে বিগত মহারাজ ত্রিভুবন ও বর্তমান রাজা মহেন্দ্রের বিষয়েও কিছু কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে। ওর যতটুকু জানার সীমানা বলে যায় ধীরে ধীরে। দেশের কথায় খুশীতে ভরে ওঠে ওর সুগৌর নিটোল মুখখানা।

ভোরে এসে মঙ্গল সিং দোকানের ভার নেয়। আমরাও রওনা হই যার যার ঝোলা লাঠি নিয়ে গন্তব্যপথে। ঠাণ্ডায়

ঠাণ্ডায় হাঁটতে বেশ ভাল লাগে। রোদ বাড়লে কষ্ট হয়; বড় জোর দশটা কি এগারোটা অবধি হাঁটা চলে।

॥ ১০ ॥

বেলা নটায় এলাম কুমারচটি। এখানে ধর্মশালায় উঠলাম। চৌকিদার আমাদের জন্য একটা বড় ঘরের তালা খুলে দিল। ঘরজোড়া শতরঞ্জি বিছানো। যাত্রীর বেশী ভিড়ই বারান্দায়। এই ঘরে কোন যাত্রী ছিল না, শুধু আমরা চারজন। ঝরনার পাইপে প্রচুর লোকের ভিড়; কোনরকমে স্নান করে ফিরছি, এক দোকান থেকে একটি ছেলে বলে উঠল, "লেংড়ী লেওগে মাঈজী?"

জিজ্ঞেস করি, "ইসিমে কেত্না পয়সা লেওগে?"

ছেলেটি বলে, "এক আনা দিজিয়ে গা।" চারটি পয়সা দিয়ে শাক নিয়ে ঘরে ফিরছি, পাশের একটি দোকান থেকে একটি ছেলে বলে ওঠে, "মিঠি পান লিজিয়ে মাঈজী।" সাগ্রহে পান তুলে ধরে। মিষ্টি পান যদিও পছন্দ করি না, তবুও ছেলেটির আগ্রহ মেটাতে চার পয়সা দিয়ে দু খিলি পান নিয়ে চলে আসি।

ধর্মশালায় তখন রান্নার ধুম লেগেছে। মাদ্রাজী মারাঠী হিন্দুস্থানী বাঙালীর ডাল-ভাত-চচ্চড়ি কিংবা রুটি, যার যা রুচি। বঁটি দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াচ্ছি—লেংড়ী ও আলুতে চচ্চড়ি হবে।

একটি ছেলে এসে জিজ্ঞেস করে, "এখানে সেনগুপ্ত বলে কেউ উঠেছে কি না বলতে পারেন?"

"কই জানি না তো!" বলেই খেয়াল হল দুটি ছেলে

বুড়োমায়ের কাছে কী যেন জিজ্ঞেস করছিল। যদি তারাই হয়! তাই বুড়োমার কাছে চললাম ছেলেটিকে ওঁর কাছে বসিয়ে রেখে। বুড়োমাও এলেন। সবাই মিলে বদ্রীনাথের কথা চলল।

ছেলেটি বদ্রীনাথধাম থেকে ফিরেছে। কাঁধের ক্যামেরা ফ্লাস্ক ও লাঠি নামিয়ে রেখে বসল। নাম সুবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত।—কদিনে উঠলেন নামলেন? দলে কজন লোক ছিল? ওখানে শীত কেমন? পথে বরফই বা জমেছে কতটা? বদ্রীনাথে কদিন ছিলেন? ইত্যাদি নানা প্রশ্ন করি।

"আমরা তিন দিনে উঠেছি, নামবও তিন দিনেই। ওখানে তিন দিন থাকার নিয়ম, আমরা দু দিন ছিলাম। দল বলতে আমরা তিন বন্ধু। বদ্রীনাথে শীত তেমন একটা কিছু নয়। কেদারেই শীত বেশী, বরফও ওদিকেই বেশী শুনেছিলাম। কিন্তু পাহাড়ীরা বলছে, এবারে কেদারে পাপ ঢুকে বরফ গলিয়ে দিয়েছে, আর বরফ নাকি এবার বদ্রীনাথেই বেশী। একথা ওদিককার পাহাড়ীদের মুখে শোনা।"

উনি বললেন, "আমাদের যাওয়া যে কদিনে ঘটে ওঠে জানি না। যে দুর্গম রাস্তা তাতে চলার সামর্থ্যও খুব কম। আমি বাতের রোগী, এঁরও শরীর ভাল নয়। আর ওনাদেরও বয়েস হয়েছে।"

ছেলেটি উত্তর দেয়, "পথ যে দুর্গম তাতে সন্দেহ নেই, তবে এই জায়গার এমন মাহাত্ম্য যে মাঝে মাঝে একটু বিশ্রাম করে নিলেই আবার চলার উৎসাহ আসে।"

বুড়োমা বলেন, "ভগবানের এমন দয়া! চলার কষ্টকে আর কষ্ট বলে মনে হয় না। নইলে কি আর প্রতি বছর এত লোক যাতায়াত করতে পারে?"

ছেলেটির কথা শুনে আশ্বস্ত হয় মন। কিছু ঘরে তৈরী খাবার ছিল, ছেলেটিকে দিলাম। খেতে খেতে বলে, "ঘর ছাড়ার পর এই আজ ঘরের তৈরী খাবার খেলাম।"

অবশেষে কেদারনাথ তুঙ্গনাথ ত্রিযুগীনারায়ণ গুপ্তকাশীর নানা কথার আলোচনা। যাবার সময় ছেলেটি আমাদের ফোটো তুলে নিল। তখন বেলা তিনটে।

উভয়ত বিদায় জানিয়ে আমরাও রওনা হই। দূরের নীল পাহাড় যেন কুয়াশায় ঢেকেছে। টিপটিপ বৃষ্টির সম্ভাবনা।

বেলা পাঁচটার পরই সূর্যদেব লুকিয়ে পড়েন শিখরান্তরালে। এর পর বড় জোর এক দেড় ঘণ্টা পথ চলা সম্ভব। সন্ধ্যার পর ওই সংকীর্ণ গিরিপথে চলা বিপজ্জনক। তাই বেলা তিনটে থেকে সাতটা অবধি চলে যাত্রীদল। সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন পথও তন্দ্রালস চোখে ঝিমিয়ে পড়ে ক্লান্তদেহ পথিকের মত।

কখনও সন্ধ্যার আগেই মুখ ঢাকেন সূর্যদেব মেঘের আড়ালে। বইতে থাকে কন্‌কনে ঠাণ্ডা পাহাড়ী হাওয়া। উড়িয়ে দেয় পথের ধুলো, উড়িয়ে নিতে চায় গাত্রাবাস।

সেদিনও মেঘরৌদ্রের খেলা চলছিল, হঠাৎ বেজে ওঠে মেঘের জয়ভেরী। দমকা হাওয়ায় একেবারে ঝমঝম করে নামল বৃষ্টি। ভিজিয়ে দিল পথঘাট মানুষজন। পাহাড় বেয়ে তরতর করে নামে জলের ধারা। একে ঠাণ্ডা হাওয়া, তায় আবার মুষলধারে বৃষ্টি। যত চলি, পথ যেন ততই দুর্জ্ঞেয় হয়ে ওঠে। ক্রমাগত হাঁটার দরুন কোমর থেকে পা দুটি যেন ব্যথায় টনটন করতে থাকে। তার ওপর বৃষ্টিতে ভিজে শরীর ভারাক্রান্ত। হাঁটা দায়। রক্ত জমাট বেঁধে আসতে চায়। বৃষ্টি তো নয়, যেন তুহিনপাত!

কঠকঠ করে কাঁপতে কাঁপতে পথ চলি আর ভাবি, অশক্তের পক্ষে তো পথ এমনিতেই দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয়ে উঠছে, তার মাঝে এ কী বিঘ্নবিপদ! বদ্রীনাথ, রক্ষা কর! এই তো প্রচণ্ড রোদে গরমে হিমসিম খাচ্ছিলাম, আবার এরই মধ্যে ধরিয়ে দিলে হাড়কাঁপুনি? এ সময়ে এ কী দুর্দৈব! কেন এ ছলনা মায়াময়? আর যে চলতে পারি না।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে আশ্রয় নিলাম সবাই। জল ঝরে পড়ছে সর্বাঙ্গে। সঙ্গে নেই বর্ষাতি। চোখের চশমাও ঝাপসা হয়ে এলো। খুলে ব্যাগে রেখে দিলাম। দূরের নীল পাহাড় সাদা হয়ে গেছে জলের ধারায়।

বুড়োমা বললেন, "এ সবই সেই চক্রীর চক্র মা! তাঁকে দেখার জন্য মনের আর্তি কতটুকু এ তারই পরীক্ষা।"

কপালের বৃষ্টিধারা মুছতে মুছতে ভাবি, ওগো অনন্ত শক্তিধর, তোমার শক্তির পরীক্ষায় কেবলি যে হেরে যাচ্ছি। আমরা যে সবার নীচে সবার পিছে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেছি; শেষরক্ষা হবে তো? কাঁপছি আর ভাবছি বিশ্বকবির বাণী—

'চির-শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে
লও, সেই অভিষেক ললাট-'পরে।
তব, জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ
ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা,
বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা—
নিষ্ঠুর সংকট দিক সম্মান।'

সুখে আনে বিভ্রান্তি, আনে সংশয়, ভাবে বুঝি এই দীনদুনিয়ার মালিক সে নিজেই—তাই সুখের মধ্যে তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় না; কঠিন দুঃখের পথেই ধরা দেন দুঃখহারী। তাই

পাণ্ডবজননী কুন্তী বলেছিলেন, 'হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে নিত্য নূতন করে দুঃখ দিও, তবেই আমি তোমাকে ভুলব না প্রভু।" দুঃখ দিয়েই পরীক্ষা করেন ভগবান ভক্তি ও শক্তির। এই বৃষ্টিধারাই হয়তো শরীরে জোগাবে এগিয়ে চলার নবীন শক্তি।

বৃষ্টি থেমে যায়। আবার পথ চলা শুরু করি দিনান্তের। ওই দীর্ঘ পথটিকে কে যেন ছোট্ট করে গুটিয়ে এনে দেয় হাতের কাছে। দেখা যায় খনৌটি চটি। রেন্-কোট গায়ে হনহনিয়ে চলেছে সেই তরুণের দল। আজকেই ওরা যোশীমঠ যাবে। কথা ছিল আমাদেরও যাবার। কিন্তু ভিজে একশা হয়ে গেছে সব—তাই থেকে যাই এই চটিতেই।

তরুণ দলের পরিচিত একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল, "হ্যালো মিস্টার গুপ্ত, আজকে যোশীমঠ যাবেন না ?"

উনি উত্তর দেন, "না, আজকে আর যাওয়া চলবে না। এই বাদলায় পায়ের ব্যথা বেড়ে যাবে।"

ওরা চলে যায়। আমরা দোতলায় উঠে জামাকাপড় বদলে নিলাম। আগুনে অবশ হাত-পাগুলোকে একটু তাতিয়ে নেওয়া গেল। ওঁর পায়ে গরম তেলের মালিশ দিতে হয়, নইলে বাতের ব্যথায় হাঁটা অসাধ্য।

নন্দলাল নিয়ে এল চা, সেউভাজা-ঝুরিভাজা—বুড়োমায়ের জন্য দুধ। গরম কাপড় গায়ে জড়িয়ে সবার কথাবার্তা চলতে থাকে। বুড়োমা ও নাইডু বাংলা ও মাদ্রাজী ভাষার তর্জমা নিয়ে ব্যস্ত। উনি শুয়ে শুয়ে বই পড়ছেন। আমি খাতা নিয়ে বসেছি। নন্দলাল গল্প জুড়েছে তার নেপালী বন্ধুর সঙ্গে। সারি সারি উনুনে যাত্রীদের রুটি তরকারি বানাবার সমারোহ। নানা ভাষাভাষীর চলে গালগল্প।

যোশীমঠ

॥ ১১ ॥

অংশুমালীর আলো তখনও আকাশের গায়ে বিকীর্ণ হয় নি। সবেমাত্র চলেছে তার সূচনা। গিরিপথ আবছা আঁধারে ঢাকা। ওরই মধ্যে চলেছে ব্যবসায়ীদল অগুন্তি ছাগপৃষ্ঠে পণ্যদ্রব্য নিয়ে বদ্রীনাথের দিকে। ছাগলের গলায় ঘুঙুর বাঁধা। বহুদূর থেকে শোনা যায় ওদের আগমন-বার্তা—ঠুং ঠুং ঠুং, ঠুং ঠুং ঠুং। ভোরের আলোয় নিশাচর পশুরা লুকোয় তাদের গুহাগহ্বরে। পাখীরা নীড় ছেড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায় আকাশে। মাঝে মাঝে শোনা যায় তাদের কিচিমিচি কলকাকলি। চলে উত্তরবাহিনী বলাকা মুক্তপক্ষে অসীম আনন্দে—মানসের পথে।

যাত্রীগণ চলে বদ্রীবিশালার নিবিড় রহস্যপুরীর টানে সামনের দিকে এগিয়ে। পাহাড় যেন পথিককে কেবলি কাছে ডাকছে। যতই এগুতে থাকি ততই সে মায়াপুরীর নব নব রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে দূরে সরে যায়। পাহাড়ের পর পাহাড় যেন অনুপম সৌন্দর্যের পটপরিবর্তন করেই চলেছে।

এককালে এখানে ছিল ব্রহ্মর্ষি ও মহর্ষিদের পুণ্য তপোবন। কালের ইঙ্গিতে আজ তা নিশ্চিহ্ন। মহাকালের সাক্ষীরূপে আজও সেই হিমগিরি ধ্যানমৌন তাপসের মত দাঁড়িয়ে আছে অতীতের ক্ষীণস্মৃতি বহন করে অচল অনড় গগনচুম্বী হয়ে।

এসে যায় যোশীমঠ। উচ্চতা এর ৬,১০৭ ফিট। এটি একটি বৃহৎ ও রমণীয় পার্বত্য নগর। শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের

উত্তরধাম। যেখানে বসে আচার্য শঙ্কর তপস্যা করেছিলেন তার নাম জ্যোতির্মঠ। পাহাড়ের সবচেয়ে উঁচু ও নির্জন জায়গা।

নীচে ধর্মশালা দোকানপাট ডাকবাংলো—এই সব। আর সেই পাহাড়ের চূড়ায় শ্যামল তৃণাস্তৃত সমতল ভূমিতে একদিকে নবদুর্গা ও শিবের মন্দির, অন্যদিকে স্বামিজীর সাধনপীঠ।

আচার্য শঙ্কর যখন সেখানে তপস্যানিরত ছিলেন তখন হয়তো গহনবনানীর অন্তরালে বড়জোর ছিল একখানা পর্ণকুটির। আজ সেখানে ফল ও ফুলের বাগান-ঘেরা দ্বিতল-সৌধ অতীতের গৌরববাহী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বহুদূর থেকেই দেখা যায় জ্যোতির্মঠের চারদিকে গৈরিক পতাকা মুক্ত আনন্দে হাওয়ায় দুলছে। দোতলার বড় হলঘরটির মাঝখানে প্রকাণ্ড সেগুনকাঠের সিংহাসনে শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্যের আলেখ্য ও শ্বেতপাথরের পাদুকা। অসংখ্য বড় বড় গোলাপে সিংহাসন ছাওয়া। চারধারের দেওয়ালে আচার্যদেব ও তাঁর প্রধান শিষ্যদের চিত্রাবলী। মেঝেতে কাশ্মীরী গালিচা বিছানো। চন্দনের স্নিগ্ধ মিষ্টি গন্ধে ঘরটি ভরে উঠেছে।

বর্তমান আশ্রমাধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ সরস্বতীজী সেখানে ছিলেন। আমরা কয়েকজন দর্শনার্থী গিয়ে তাঁর তক্তাপোশের কাছে মেঝেতে বসলাম। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর প্রসঙ্গ-ক্রমে একজন দর্শনার্থী প্রশ্ন করলেন, "ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, এ কথার প্রকৃত অর্থ কী? এ জগৎ যদি মিথ্যাই তবে ভগবান কেন এর সৃষ্টি করলেন? জগতের কি তবে কোন মূল্য নেই?"

প্রশান্ত হাসিতে তিনি উত্তর দিলেন, "ব্রহ্মের সঙ্গে তুলনায়

ব্রহ্মাণ্ড অতি ক্ষুদ্র, নিয়তপরিবর্তনশীল। এর উপমা চলতে পারে অনন্ত জলধি ও তার বুদ্বুদ, একটি বিরাট অগ্নিগোলক ও তার স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে। সুতরাং এই ক্ষণভঙ্গুর নিত্যবিনাশশীল বস্তু সেই অবিনশ্বর বস্তুর নিকট অতি অকিঞ্চিৎকর নয় কি?

এই জগতের মূল্য কী বা কতটুকু—জানতে পারলে যে সব গোলই মিটে যায়। যেমন দুধের মধ্যে মাখন আছে জানি অথচ চোখে দেখতে পাই না, মন্থন করলে তবে পাই; তেমনি ব্রহ্মের যে শক্তি সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত তাকে যখন জ্ঞান-বিচার দ্বারা অন্তরে ঘনীভূত করা যায় তখনই দেখা যায় দুধের সারভাগ নবনীরূপ ব্রহ্ম ও অসারভাগ তার জলরূপ এই জড়-জগৎ। তাই জ্ঞানীরা বলেন, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।'

ভগবান এই জড়জগতের সৃষ্টি করলেন কেন? এর ব্যাখ্যা নানাভাবে নানাজন করে গেছেন। কেউ বলেন, এ ব্রহ্মের লীলা; কেউ বলেন, খেলা; কেউ বলেন, সমরাঙ্গন; কেউ বা বলেন, পরীক্ষাক্ষেত্র। ধর, যেমন ভালর পাশে মন্দ, আলোর পাশে আঁধার, সুখের পাশে দুঃখ থেকে একে অন্যের যথার্থ মূল্য নির্ধারণ করে—এও ঠিক তেমনি। এই অসত্য বস্তু থেকে পরমসত্যে পৌঁছনোর ইঙ্গিত এই জগৎ। অর্থাৎ এই খণ্ডের মধ্যে যে অখণ্ড অংশ, জড়ের মধ্যে যে চৈতন্য অংশ আছে তাকে বেছে নিতে হবে। কিন্তু এ একটা ভারি মজার দেশ। মায়ার জাদু নিয়তই এখানে লাগ ভেলকি লাগ বলে নয়কে হয় বলে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এর চার-পাশে যে রূপ-রস-গন্ধের ছড়াছড়ি তা দেখে মন বিভ্রান্ত হয়, ভাবে আজীবন এই আনন্দ আমি আহরণ করব। কিন্তু জাদু তো কখনও সত্যি হতে পারে না। ফল হয় দুঃখ। মানুষ এই দুঃখে কাঁদা আর সুখ খোঁজা নিয়েই জীবন কাটিয়ে দেয়।

বিশ্বের ইন্দ্রজালে ভুলে যায় বিশ্বপতিকেই, ভুলে যায় সেই পরমসত্যের সন্ধানের কথা।”

প্রশ্ন করেন অন্য একজন, “তবে আমাদের মত সর্বসাধারণের পক্ষে সেই পরমসত্য লাভের উপায় কী?”

উত্তর দিলেন স্বামিজী, “উপায় অপায় দুটোই রয়েছে, যে যেটা বেছে নেয়। মানুষের মধ্যে সদ্‌গুণ ও ষড়রিপুর লড়াই চলেছে নিরন্তর। কেউ হারে, কেউ জয়ী হয়। সাধনপথের প্রধান কথাই হল, ‘মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন’—অর্থাৎ প্রাণপণ করে ধর্মসাধন করবে। কিন্তু বর্তমান মানুষের মতবাদ—খাও দাও ফুর্তি কর, ভগবানের কথা—সে পরে দেখা যাবে। ওদিকে কাল যে ঘরের কোণায় দেখতে পায় না। তাই বারবার মরণসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে, অমৃতের সন্ধান করার সময় হয় না। দৈহিক চাহিদা মেটাবার জন্যে মানুষ কত না কষ্ট স্বীকার করে, কিন্তু আত্মিক উন্নতির জন্যে একটু ত্যাগ বা কষ্ট স্বীকার করতে হলেই ভাবে কী বিপদ। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে এসে স্কুল-পালানো ছেলের মত বিলাসের অলস স্রোতে গা ভাসিয়ে দিলে সত্যসন্ধান তো হয় না। সত্যসন্ধানী যারা তারা অন্তরগুহায় তিল তিল করে প্রাণের সাধনাগ্নি জ্বালিয়ে রাখে, ঝড় ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে অচঞ্চল দৃঢ়তায় এগিয়ে চলে গন্তব্যপথে। সেই সব শক্তিমান সাধকের দৃষ্টিতেই এ জীবময় জগৎ হয় শিবময়।

জগৎকে সমরাঙ্গন বল আর পরীক্ষাক্ষেত্র বল এভাবেই হারজিতের খেলা চলছে অবিরাম। শিবোঽহম্‌ শিবোঽহম্‌, জয় গুরু জয় গুরু”—বলে কথা সমাপ্ত করলেন তিনি।

আমরাও তাঁকে প্রণাম করে উঠে পড়ি। ‘কল্যাণপথ’ বলে একখানা বই তিনি আমাদের দিলেন। আচার্য শঙ্করের

তৈলচিত্রের দিকে চেয়ে থাকি। অখণ্ড ব্রহ্মচর্যে মানুষ এমনি দেবদুর্লভ জীবন লাভ করে।

দোতলার দর্শনীয় স্থানগুলি দেখে নেমে এলাম নীচে। সামনের বারান্দা থেকে সরু একটি লাল কাঁকর বিছানো পথ গেট অবধি গেছে। ওই পথের দুধারে কেয়ারী করা গোলাপঝাড়। অন্যান্য ফুল থাকলেও গোলাপই বেশী। আর এখানকার গোলাপগুলো আমাদের দেশের গোলাপের চাইতে অনেক বড়। গোলাপী লাল হলুদ সবুজ সাদা—নানা রঙের গোলাপ। যেমন তার সৌন্দর্য, তেমনি মিষ্টি গন্ধ।

ফলের বাগানে ধরেছে গুচ্ছ গুচ্ছ আপেল। আমাদের দেশে পেয়ারাগাছে যেমন ধরে থাকে থোকা থোকা পেয়ারা ফল, ঠিক তেমনি। তুলসীমঞ্চে কী বড় কৃষ্ণতুলসীর ঝাড়!

ফল ও ফুলের বাগানের শেষে খানিকটা জায়গা সবুজ ঘাসে ছাওয়া। একখানা সবুজ মখমল যেন কেউ বিছিয়ে রেখেছে।

সবাই বসি এসে মাতা নবদুর্গার মন্দিরের বারান্দায়। জয়পুরী সাদা পাথরের মূর্তি। সেই হাসিভরা দেবীমূর্তির দিকে তাকিয়ে ভুলে যায় মন পথের কষ্ট। বারান্দার সামনেই মায়ের পূজো করা ফুল স্তূপীকৃত হয়ে পড়েছিল। সকলে মুঠো করে কপালে মাথায় ছোঁয়াই। মন্দিরের দরজা বন্ধ। লোহার গরাদের মধ্য দিয়েই দেখে নিই মাকে।

সেখান থেকে একটু দূরেই শিবের মন্দির। ছোট্ট ঘরটি, মাথা নীচু করে ঢুকতে হয়। ঘরের মধ্যে একটি বড় শিবলিঙ্গ স্থাপিত। পাশেই ঝারিতে জল ছিল, ধারা দিই শিবের মাথায়। এই জায়গাটি বেশ বড় বড় গাছে ঢাকা মুনিঋষির আশ্রমের মত। কয়েকটি সাধুও দেখলাম একপাশে থাকেন।

এখানকার ঝিরঝিরে মিঠে হাওয়া বয়ে আনে কোন্ অমৃতলোকের পরশ। সংসার-কোলাহলের ঊর্ধ্বে এই বিজন পরিবেশে চঞ্চল মন আপনি শান্ত হয়ে আসে। পেছনে পড়ে থাকে ধনজনমানের মোহ। আকাশ-বাতাস ঘিরে মুক্তির কী অসীম উল্লাস! মনে হয় মিথ্যা কুহকে আবদ্ধ হয়ে আছি আমরা সংসারের চিড়িয়াখানায়। মানবসৃষ্টি যেন সেই অফুরন্ত আনন্দের মানসলোক হতে নির্বাসিত। আর তারই কান্নার রোলে ভরে উঠেছে পৃথিবী।

এই শান্ত সুন্দর পরিবেশে কেবলি মনে হচ্ছিল, ঠিকই, এ যেন চিরবসন্তের রাজ্য!

পৃথিবীর মানুষ নিয়ত সংগ্রাম ও সংঘাতে জর্জরিত হয়ে মরে আজীবন; নিরুদ্ধ কান্নার আবেগে ভরে ওঠে বুক; না পায় শান্তি না পায় স্বস্তি—তবু কি ভাবে শান্তির পথ কোথায়? যুগে যুগে তাই মহাপুরুষদের ঘটে আবির্ভাব। তাঁদের শান্তির বাণী টেনে নেয় তাপক্লিষ্ট জনগণকে অপার করুণায় স্বার্থপঙ্ক হতে সুধাসিন্ধুতীরে—যেখানে নেই স্বার্থ-দ্বন্দ্বের হানাহানি, নেই ভোগকোলাহল, নেই কামনার বিকার।

নৃত্যনির্ঝারণী

॥ ১২ ॥

আজ চলেছি বিষ্ণুপ্রয়াগের পথে। ক্রমাগত দু মাইল ঢালু পথ। নীচের দিকে নামতে নামতে মনে হচ্ছিল যেন বলিরাজভবনে আমন্ত্রিত অতিথি আমরা। বাঁকের পর বাঁক ঘুরে নীচের দিকে চলেছি তো চলেইছি। কে যেন হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে পাতালের দিকে। থামতে চাইলেও

থামা যায় না। অনেক নীচে দেখা যায় বিষ্ণুগঙ্গার রুপোলী জলধারা দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে। শোনা যায় সোঁ সোঁ শব্দ।

অলকানন্দা ও বিষ্ণুগঙ্গার সঙ্গমস্থলে পুলের উপর এসে দাঁড়ালাম। পাশেই বিষ্ণুমন্দির। একদা এখানে বিষ্ণুর আরাধনা করে নারদ সর্বজ্ঞ হওয়ার বর লাভ করেছিলেন। গঙ্গার দৃশ্য এখানে অপরূপ! কোন্ সুদূর শৈলশিখর থেকে নেমে এসেছে উন্মাদিনী গঙ্গা, ছুটে চলেছে কোন দূরান্তরে কিসের সন্ধানে কে জানে! সফেন উদ্দাম ঊর্মিমালার সে কী গভীর কল্লোল!

একদা এমনি করেই বুঝি বা বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলু হতে ধূর্জটির জটাজালে অবতীর্ণা হয়েছিলেন। তাই মহর্ষি বাল্মীকির উক্তি—

'গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি চরণচ্যুতম্।
ত্রিপুরারি শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মা॥'

দূরে দেখা যায় চাষীরা পাহাড় কেটে ধাপে ধাপে বুনেছে রবিশস্য। কোথাও সবুজ কোথাও সোনালী। দূর থেকে মনে হয় স্বর্গের দিকে হাজারো সিঁড়ি হাত বাড়িয়ে আছে। দূরে পাহাড়ীদের হাট বাজার বাড়িঘরও দেখা যায় মাঝে মাঝে।

পথের একদিকে মেঘছোঁয়া গিরিশ্রেণী, অন্যদিকে গভীর খাদ—তার পাশে পাশে ছুটে চলেছে নৃত্যনির্ঝরিণী বিষ্ণুগঙ্গা। কখনও সুবিশাল শিলাখণ্ডে উচ্ছল উদ্দাম, কখনও উপলে উপলে চপলচরণা।

এই বিশাল গিরিগাত্র কেটে কেটে মানুষ তৈরি করেছে গিরিপথ। কোথাও এই পথ এত সঙ্কীর্ণ যে দেড় হাত দু হাত মাত্র চওড়া। পাহাড়ের গা ঘেঁষে যাত্রীরা চলতে থাকে

রোদ জল ঝড় উপেক্ষা করে। পথের কষ্ট নীরবে বহন করে। আগত ও প্রত্যাগত যাত্রীদলের মধ্যে চলে সম্ভাষণ— 'জয় বাবা বদ্রীবিশাললাল কী জয়।' ওই একই পথ ধরে চলে ব্যবসায়ীদের ছাগল গরু মোষ ও ঘোড়ার দল। চলে অশ্বারোহী যাত্রীরা, ধনকুবেরদের ডাণ্ডি কাণ্ডি যানবাহন। মাঝে মাঝে দেখা যায় বলিষ্ঠ পাহাড়ী কুকুরের দল আপন মনে চলে যায়, অনিষ্ট করে না যাত্রীদের।

পিছু নেয় ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলেমেয়ের দল। ওদের বাঁধাবুলি আওড়াতে থাকে—শেঠজী, এক পয়সা দো, তেরা ধরম হোগা। রাণীজী, তাগা সুঁই দো, তেরে পুণ্য হোগা ইত্যাদি। যতক্ষণ না কিছু মেলে, সবাই দল বেঁধে দৌড়তে থাকে। অবশ্য সব যাত্রীই কেউ পয়সা কেউ তাগা সুঁই কিছু না কিছু দেয় ওদের। ওই জিনিসটি দুষ্প্রাপ্য ওখানে। পেলে ভারি খুশী হয় ওরা।

যত চলি, পথ যেন অফুরান হয়েই চলেছে। বিশেষ করে শহুরে লোকেদের ট্রাম-বাসে চলা অভ্যাস। তাই রোজ আট দশ মাইল হাঁটা অত্যন্ত কষ্টকর। বিশেষ করে এই কমজোরী বুড়োর দলের পক্ষে। শরীরে নেই চলার বেগ, শুধু মনের আবেগই টেনে নিয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে এই ক্লান্ত দেহগুলোকে। মাঝে মাঝে মনে হয়, আর তো পারি না, কী করে চলব অত পথ ?

পাশেই নৃত্যলোলা জাহ্নবী চলেছেন ধেয়ে। তাঁর অবিশ্রাম কলগীতি পথিককে এগিয়ে চলার উদ্দীপনা এনে দেয়। পথের পাশে শিলাখণ্ডে বসে শুনি সেই গান, 'চল্ চল্ এগিয়ে চল্।' মুষড়ে-পড়া মনে আনে এগিয়ে চলার

জোয়ার। না, আর বসে থাকা নয়। যে উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি সে সিদ্ধি যে এখনও সুদূরপরাহত, থামলে তো চলবে না।

সুরধুনীর তীরে তীরে পাইন বন। তারই ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় ভাগীরথীর বিরামহীন সাবলীল গতি। সেই অবিরাম কলনাদ—মনে হয় কোন্ অদৃশ্য শিল্পীর বীণাযন্ত্রে চলছে একটানা সুরঝংকার।

উপরে নীলাকাশ। নীচে কালো পাহাড়ের ঢেউ। আর তারই বুক চিরে ছুটে চলেছে শ্বেতোর্মিমালিনী গঙ্গা। তীরে তার শ্যাম লতাগুল্ম আর চির্‌পাইনের সারি। কী যে সুন্দর লাগে ওই চির্‌পাইনের সারি! প্রতি স্তবকের চারধারে সোনালী পাতাগুলো ছড়িয়ে আছে, মাঝের চূর্ণপত্রগুলি চাঁচরচিকুরধারীর শিখীপাখার মত। বাতাসে দুলে যায় গাছের পাতা—নেচে চলে বুঝি ব্রজের গোপাল বনমালী।

শিখর সৌন্দর্য

॥ ১৩ ॥

সন্ধ্যা হয় হয়। সোঁ সোঁ শব্দে বইল হাওয়া, নামল জল। জামাকাপড় ভিজে একাকার হয়ে গেল সব। কাছেই চটির দোতলায় গিয়ে উঠলাম। খোলা দরজা ও জানলা দিয়ে হুহু করে ঢুকছে হিম-হাওয়া। শীতে জমে যেন বরফ হয়ে গেলাম। একদল যাত্রীর রান্নাখাওয়া শেষ। উনুনে গনগনে আগুন। ওদের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে অবশ হাত-পাগুলোকে একটু সেঁকে নিই। কোনমতে কম্বলমুড়ি দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাতটা কাটিয়ে দিলাম সবাই।

ভোর হয়ে গেল। এবারে রওনা হবার পালা। বুড়োমা,

নাইডু চা খাচ্ছিলেন। আমরা নামতেই দু গ্লাস চা এগিয়ে দেয় দোকানী। বৃষ্টি থেমে গেছে। সোনালী রোদ গাছের আগায় পাহাড়-চূড়ায় চিকমিক করছে। দুষ্টু ছেলের কান্নাশেষে হাসির মতই মিষ্টি।

বেলা আটটায় পৌঁছলাম পাণ্ডুকেশ্বর। এখানে যোগবদরী মন্দিরে পাণ্ডুরাজ স্থাপিত বদ্রীনাথের মূর্তি। সম্মুখশিখরে তপস্যা করতেন পাণ্ডুরাজ। লোকজন নেই, নির্জন মন্দির, আমরা ভিতরে গিয়ে বসলাম। বেশ কিছুক্ষণ বসেছিলাম। একজন পাণ্ডা এসে প্রশ্ন করল, "বাবুজী, আপলোগ কঁহাসে আয়ে?" উনি উত্তর দিলেন, "হম্‌লোগ কলকাত্তাসে আতা হ্যায়!" আর দু-চারটি কথা। নাইডু ও বুড়োমা এসে পাশে বসলেন। আমি চুপ করে বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। পাণ্ডাজী বললেন, "আচ্ছাসে প্রভুজীকো দর্শন কর লো মাঈজী।" বলে তিনি বিগ্রহের গায়ের ঢাকনা সরিয়ে দিলেন। একটি কালো ঘাগরায় গলা থেকে শরীর ঢাকা ছিল। শুধু মুখখানার দিকে তাকিয়েছিলাম। এবার দেখতে পেলাম সম্পূর্ণ শরীর। সুন্দর সুঠাম শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী পদ্মাসনে উপবিষ্ট হেমকান্তি বদ্রীনাথ।

বুড়োমা বললেন, "মা জননী, আর দেরি নয়, বেলা বেড়ে যাচ্ছে।"

উত্তর দিই, "এই তো, চলুন।"

প্রণাম করে উঠতেই পাণ্ডাজী আমাদের হাতে চরণামৃত তুলসী ও প্যাঁড়াসন্দেশ দিলেন। পাণ্ডুকেশ্বর চটিতে ভাল দুধ ও খাবার পাওয়া যায়। খেয়ে নিয়ে আবার পথ চলা শুরু হয়।

ভোরের রোদ গিরিরাজকে পরিয়ে দিয়েছে স্বর্ণমুকুট।

দূরে দেখা যায় তুষারাবৃত পর্বতমালা, রামধনুর রকমারি রঙে রঙিন হয়ে উঠেছে। বিচিত্র সে বর্ণসমারোহ! কোথাও রুপোলী পাহাড় বেয়ে সোনালা ঝরনা বইছে। কোথাও নীল পাহাড়ের বুকে সাদা মেঘগুলো স্তবকে স্তবকে জমাট বেঁধে আছে। কোথাও পাহাড় সাদা-কালোয় সোনালী-রূপোয় ডোরাকাটা।

কোথাও উপর থেকে সহস্রধারায় নেমে আসছে তুহিনপাত। উপর থেকে সেই জলধারা বিরাট শিলাখণ্ডে পড়ে উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে, প্রচণ্ড গর্জনে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। সেই হিমশীতল বারিধারা উপলের বুক বেয়ে ছুটে চলেছে কোথাও দুরন্ত বেগে, কোথাও ঝুরুঝুরু ঝিরিঝিরি। পাহাড়ের গা বেয়ে এমনি সরু সরু ঝরনা পাশাপাশি বইছে, মনে হয় শুভ্র যজ্ঞোপবীতধারী নবীন ব্রহ্মচারী হিমাদ্রিরাজ!

এই পাষাণপুরীর ভিতরে যতই প্রবেশ করছি, ততই যেন শিখরের পর শিখরমালা দুর্জ্ঞেয় ইন্দ্রজাল রচনায় তৎপর হয়ে উঠেছে। সেই তুলনাহীন সৌন্দর্যে মন বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়।

ছেলেবেলায় শুনেছিলাম ওই তুহিন-মেরু অন্তরালেই নাকি হিন্দুর কাঙ্ক্ষিত স্থান গোলোকধাম বা বৈকুণ্ঠপুরী। কিন্তু এই জনশ্রুতির মূলে কতটা সত্যতথ্য নিহিত কে দেবে সেই প্রতিশ্রুতি? কৈলাসধামে শিবশিবাণীর দেখা আর মানস-সরোবরে নীলপদ্মের সন্ধান না পেলেও সেই স্থানের নানা জনশ্রুতি শোনা যায় বহুজনার মুখে! এই পথেই পঞ্চপাণ্ডব স্বর্গারোহণ করেছিলেন। ইন্দ্রের অমরাবতী ও যক্ষরাজের অলকাপুরী এই পথেই শোনা যায়। কে দেবে সে পথের নির্দেশ?

দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম নাকি এই পথেই সহস্রদল পদ্ম সংগ্রহ করতে যক্ষপুরীতে গিয়েছিলেন। মহাভারতে এই সম্পর্কে একটি চমৎকার উপাখ্যান আছে।

একদা এই বদরিকাধামে পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীসহ বেড়াতে এসেছেন। বাতাসে একটি সহস্রদল পদ্ম পাঞ্চালনন্দিনীর কাছে এসে পড়ল।

দ্রৌপদী পদ্মটি হাতে নিয়ে ভীমকে বললেন, 'দেখ, এ ফুলটি কি সুন্দর ও সুগন্ধ, আমি এইটি ধর্মরাজকে দেব। তুমি আমাকে আরও কটি সহস্রদল পদ্ম এনে দাও, আমি কাম্যক-বনে নিয়ে যাব।'

দ্রৌপদীর ইচ্ছাপূরণের জন্য ভীম সেই গহনপথ পেরিয়ে চললেন। কিছু দূর গিয়ে দেখতে পেলেন একটা বানর পথ জুড়ে শুয়ে লেজ নাড়াচ্ছে। ভীম তার কাছে গিয়ে ভীষণ জোরে চীৎকার করলেন। বানরটি মিটমিটে চোখে চেয়ে বলল, 'আমি রুগ্ন, নিজের মনে ঘুমোচ্ছিলাম, তুমি আমার ঘুম ভাঙালে কেন? আমি তির্যক যোনি, ধর্ম জানি না, কিন্তু তুমি তো জান সকল প্রাণীকেই দয়া করা কর্তব্য। তুমি কে, কেন এখানে এসেছ? এই পথ দেবলোকে যাবার, মানুষের অগম্য।'

ভীম তখন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'তুমি কে? আমি সহস্রদল পদ্ম আনতে যক্ষপুরীতে যাচ্ছি। পথ ছেড়ে দাও।'

বানর বললে, 'পথ তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না। নিবৃত্ত হও, নতুবা তোমার মৃত্যু অবধারিত।'

ভীম বললেন, 'মৃত্যুর ভয় আমি করি না। তুমি যদি উঠে পথ ছেড়ে দাও, তবে তোমার কোন অনিষ্ট করব না।'

বানর বললে, 'আমি রুগ্ন, ওঠার শক্তি নেই। যদি একান্তই যেতে হয় তবে ডিঙিয়ে যাও।'

ভীম বললেন, 'সর্বদেহেই আত্মরূপে ভগবান বিরাজিত, কাজেই তাঁকে অবজ্ঞা করে তোমাকে আমি ডিঙিয়ে যেতে পারি না।'

তখন বানর বললে, 'তা হলে দয়া করে তুমি আমার লাঙ্গুলটি সরিয়ে দিয়ে চলে যাও।'

বানরের স্পর্ধায় বিরক্ত হয়ে ভীম অবজ্ঞাভরে বানরের লেজটাকে ধরে সরাতে গেলেন, ঘাম বেরিয়ে গেল, কিন্তু একচুলও নড়াতে পারলেন না। তখন জোড়হাতে ভীম জিজ্ঞেস করলেন, 'হে কপিশ্রেষ্ঠ, আপনি কে? আমি আপনার শরণাগত, আপনি আমায় ক্ষমা করুন।'

বানর নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, 'তুমি যে জন্য এসেছ অদূরেই সেই পদ্ম-সরোবর। এই পথ অগম্য বলেই আমি রোধ করেছিলাম। কিন্তু দেখো, সেই কুবের-উদ্যান থেকে না বলে যেন পদ্ম ছিঁড়তে যেয়ো না।'

হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত ভীম। সন্ধ্যায় এসে একটা নদী দেখতে পেলেন, তার নির্মল জলে অজস্র সোনালী পদ্ম ফুটে আছে। কৈলাস ও কুবের-ভবনের মাঝামাঝি এই সরোবর। রাক্ষসরা এটি রক্ষা করে। ওরা ভীমকে নিঃশঙ্কচিত্তে আসতে দেখে বললে, 'মুনিবেশধারী অথচ সশস্ত্র তুমি কে?'

ভীম পরিচয় দিয়ে বললেন, 'আমি সহস্রদল পদ্ম নিতে এসেছি।'

রাক্ষসরা বললে, 'এই যক্ষরাজের প্রমোদ-সরোবরে তাঁর অনুমতি ছাড়া যে আসে সে বিনষ্ট হয়। তুমি ধর্মরাজের ভাই হয়ে ফুল চুরি করতে এসেছ কেন?'

ভীম বললেন, 'যক্ষরাজকে এখানে দেখছি না, আর থাকলেও আমি তাঁর অনুমতি চাইতে পারি না। কেন না ক্ষত্রিয়রা প্রার্থনা করেন না। তা ছাড়া এই সরোবরের জন্ম পর্বতনির্ঝর থেকে, কুবের ভবন থেকে নয়। এতে সবারই সমানাধিকার। এই বলে ভীম জলে নামতেই রাক্ষসরা মার-মার শব্দে যুদ্ধ লাগিয়ে দিল। ভীমের হাতে শতাধিক রাক্ষস নিহত হল, অবশিষ্ট রাক্ষসেরা পালিয়ে গেল।

ভীম তখন সেই সরোবরের সুপেয় জল পেট ভরে খেয়ে মনের সুখে পদ্মদল সংগ্রহ করতে লাগলেন। পরাজিত রাক্ষসরা কুবেরকে সব কথা জানাতে তিনি হেসে বললেন, 'আমি জানি, কৃষ্ণার জন্য এই বীরপুরুষ ইচ্ছামত ফুল নিন।'

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মানুষের চোখে সেই স্বর্গলোক বা বৈকুণ্ঠধাম দৃষ্টিগোচর না হলেও একথা অনস্বীকার্য যে স্থূলদৃষ্টিতে যাকে দেখা যায় কঠিন শিলাস্তূপ, সাধকের দৃষ্টিতে তাতেই দিব্যলোক বা দিব্যধাম দৃষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। সাধারণ দৃষ্টির সঙ্গে তার তুলনা অচল। তাই জ্ঞানীগণ বলেন, 'এই সূর্য ঘোরে মহাসূর্য পাশে, চোখে নাহি দেখি জ্ঞানেতে প্রকাশে।' ভূমার অনবদ্য সৌন্দর্যের কিছুটা আভাস মেলে হিমালয়ের বিস্ময়কর দৃশ্যে, অন্তহীন বিশাল সৌন্দর্যের প্রতিভূ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নগাধিরাজ। এখানের নন্দনবনের শোভা ভগবানের অনুপম সৌন্দর্যের বিকাশভূমি। সেই চিরস্থির শান্তম্ শিবম্ সুন্দরমের বর্ণনায় ভাষা মূক হয়ে যায়। নির্বাক মন শুধু ভাবে—

সমস্ত সংসার যদি লেখ্যপত্র হয়
সমস্ত সাগর যদি হয় মসীময়

বাণী করে গুণগান লিখে গজানন
তথাপি সে অসীমের না হয় বর্ণন।

॥ ১৪ ॥

লাম্‌বগড়ে দুপুরে বিশ্রামান্তে চলেছি হনুমানচটির পথে। কোথাও পথিমধ্যে বৃহৎ শিখরশিলা ছাউনির মতই ঘিরে আছে পথটিকে। নীচ দিয়ে চলার সময় শোনা যায় গঙ্গোর্মির কুলুকুলু প্রতিধ্বনি। কোথাও সেই শিলাছাউনির তলায় দেখা যায় সন্ন্যাসীর বাস। বিশাল শিলাখণ্ডের মাঝে মাঝে ঝাউবন, দেওদা'র বন, পাইন গাছের সারি। পথের পাশে বসে বিশ্রাম নেয় পথিকেরা কেউ কেউ।

শিখর-ঝরনা ও নির্জন পার্বত্য পরিবেশ মনকে সর্বক্ষণ সেই অনন্তের আহ্বানে উন্মনা করে রাখে। যুগে যুগে তাই মুনিগণ বরণ করে নিয়েছিলেন এই ত্যাগস্বর্গকেই। উপনিষদের বাণী—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—ত্যাগেই সুখ, ভোগে নয়। ভোগকে ত্যাগের দ্বারা শুদ্ধ ও সংযত করাই মানবতার আদর্শ। নারদ শুক সৌনক সনৎ সুনন্দ ব্যাস ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি দেবর্ষি মহর্ষিগণ এই নির্জন পর্বতকন্দরেই তপস্যা করে অভীষ্ট ফললাভ করেছিলেন। মোক্ষান্বেষীগণ এখানে আসেন পরম শ্রেয়ের অন্বেষণে। জীবনের শেষ অধ্যায়ে ছুটে আসে কোন কোন ভোগবাদী বানপ্রস্থ অবলম্বনের আশায়।

স্বর্গারোহণ পর্বে পাই পাঞ্চালীসহ পঞ্চপাণ্ডব যখন ভদ্রকালীপর্বত অতিক্রম করছিলেন, তখন দূর থেকে পর্বত-রাণীর অনুচরীগণ যুধিষ্ঠিরকে দেখতে পেয়ে দ্রুতপদে এগিয়ে

এসে বললে, 'তুমি কে, কোন দেশের রাজা? কী অভিপ্রায়ে এই পুরুষবর্জিত নারীরাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করেছ?'

প্রধানা অনুচরী। এজন্য তোমাকে শাস্তি পেতে হবে, তুমি আমাদের বন্দী।

যুধিষ্ঠির। আমি পৃথিবীর রাজা যুধিষ্ঠির। এই পথে স্বর্গে যাচ্ছি। আমাদ্বারা তোমাদের রাজ্য আক্রমণ বা কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নেই। তোমরা ভীত হয়ো না কন্যাগণ।

তা সত্ত্বেও অনুচরীরা রাজার কথা শুনে কয়েক জন তাঁকে ঘিরে রইল। কয়েকজন গিয়ে রাণী লীলাবতীকে সবিস্তারে যুধিষ্ঠিরের কথা জানাল। রাণী অপূর্ব বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে লক্ষ সখী সঙ্গে নিয়ে যুধিষ্ঠিরের কাছে চললেন।

দূর থেকে তিনি দেখতে পেলেন অপূর্ব সুন্দর এক কান্তিমান পুরুষ শিলাসনে বসে, আর তাঁর অনুচরীগণ তাঁকে ঘিরে রয়েছে। বিস্মিতা রাণী অপলকে চেয়ে রইলেন। মানুষের এত রূপ! দৃষ্টি নামিয়ে কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি মহাপুণ্যবান, তাই এই দুর্গম পথে আসা সম্ভব হয়েছে। আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার চরণদর্শন পেলাম। আমি এই পর্বতের রাণী। আমার রাজ্য আপনার পায়ে উৎসর্গ করছি, দয়া করে গ্রহণ করুন। আমি আপনার সেবিকা হয়ে থাকব। এখানে জরা মৃত্যু ব্যাধি ভয় নেই, আপনি এখানে থেকে স্বর্গাধিক সুখভোগ করুন।'

স্নিগ্ধকণ্ঠে যুধিষ্ঠির বললেন, 'হে কল্যাণী! কোন সুখভোগবাসনাই আমার চিত্তে আর নেই, একমাত্র পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শন অভিলাষ ছাড়া। আমি দীর্ঘকাল পৃথিবীর বহু দুঃখশোক ভোগ করেছি এবং পৃথিবীকে নিঃশত্রু করেছি। কিন্তু কলি আগত। পৃথিবীবাসীগণ এখন

সত্যধর্মবিবর্জিত হয়ে ঘোর অনাচারে লিপ্ত হবে—তাই শ্রীভগবান আমাকে বৈকুণ্ঠে যাবার অনুজ্ঞা করেছেন। পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে আমি সেই মহাযাত্রায় বেরিয়েছি। জননী যেমন সন্তানকে আশীর্বাদ করেন তেমনি তোমরা আমাকে আশীর্বাদ কর যেন আমার অভীষ্ট পূর্ণ হয়। জগৎপতি তোমাদের কল্যাণ করুন।'

এই বলে তিনি স্বীয় গন্তব্যপথ ধরলেন। লীলাবতী বিফলমনোরথে সাশ্রুনয়নে তাকিয়ে রইলেন সেই ধর্মাত্মার গমনপথের দিকে।

এর পর হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু হয়। রৈবতপর্বত অতিক্রমকালে সহদেব, চন্দ্রকালী পর্বতে নকুল ও নন্দীঘোষে অর্জুনের দেহত্যাগ হয়। সোমেশ্বর পর্বতে এসে ভীমও আঁর যেতে পারলেন না। ভীমের দেহত্যাগের পর একাকী যুধিষ্ঠির এগিয়ে যেতে লাগলেন শোকার্ত মনে। যত উপরে উঠছেন ততই এক অপূর্ব সৌগন্ধে চারিদিক সুরভিত হয়ে উঠছে।

গন্ধমাদন পর্বতে গন্ধর্বনারীগণ, কিন্নরপুরীতে কিন্নরী ও বিদ্যাধরীগণ যুধিষ্ঠিরকে পতিরূপে পাবার ইচ্ছায় রাজ্য ঐশ্বর্য ও লক্ষকন্যাপরিবৃত হয়ে স্বর্গাধিক সুখের প্রলোভন দেখান।

যুধিষ্ঠিরের ওই একই উত্তর, 'শ্রীকৃষ্ণের চরণদর্শন ছাড়া অন্য কোন সুখের আকাঙ্ক্ষা আমার নেই।'

রাজার কথা শুনে খিলখিল করে নারীগণ হেসে ওঠে। 'হে পুণ্যবান নরপতি, বহু পুণ্যে সশরীরে তুমি এখানে এসেছ, মানবীয় সুখভোগে নিজেকে বঞ্চিত করে কেন এত কষ্ট করে শ্রীকৃষ্ণের জন্য ব্যাকুল হয়েছ? এক নারায়ণ কী এমন সুখ তোমায় দেবেন? এখানে আমরা লক্ষ সুরঙ্গিলা দল।

জরা মৃত্যু ব্যাধির ভয় এখানে নেই; অমরাবতীর অফুরান সুখে সুখী হবে তুমি। আমরা এমন মন্ত্র তোমায় শেখাব যাতে তুমি অনায়াসে সুরপুরে বৈকুণ্ঠে যেখানে খুশি যেতে সক্ষম হবে। আমাদের অনুরোধ হেলা করে বৃথা নিজেকে কষ্ট দিয়ো না রাজন্!'

অনমনীয় দৃঢ়তায় যুধিষ্ঠিরের অটল উত্তর—'হে মাতৃসমা নারীগণ! কেন মিথ্যা প্রলোভিত করছ? শ্রীকৃষ্ণই আমার প্রাণের প্রাণ, তাঁর অদর্শনে মন আমার অত্যন্ত ব্যাকুল। ওই চরণাশ্রয় ছাড়া অন্য কোন সুখের বাসনা আমার নেই। তোমরা মায়ের মত—আমায় আশীর্বাদ কর যেন আমার অভিলাষ পূর্ণ হয়।'

লজ্জা পেয়ে সুরঙ্গিলা নারীগণ প্রস্থান করেন।

আরও উত্তরে এগিয়ে চলেন যুধিষ্ঠির। এসে যায় বৈতরণী নদী। তীরে তীরে অষ্টাশী সহস্র ঋষির বাস। নদীর ওপারে স্বর্গদ্বার। সেখান থেকে স্বর্গের দুন্দুভিনাদ তিনি শুনতে পেলেন।

সুদীর্ঘ পথ চলতে চলতে কখনও সূর্যের প্রচণ্ড তাপে ব্রহ্মতালু যায় শুকিয়ে। তৃষ্ণায় প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত। কখনও বৃষ্টিধারায় বুকে ধরে কাঁপুনি, কখনও শুকনো ধুলোর ঝড়ে আঁধার ঘনায় চোখে। নিরাশায় ভরে ওঠে বুক। ক্লান্ত চিত্তে ভাবে কোথায় এ পথের শেষ? যত এগিযে চলি ততই সে পিছনে সরে যায়। ওগো ঠাকুর, কেন এ রুগ্ন দুর্বলের মনে দিলে এই দুর্গমে চলার অভীপ্সা? এখন যে না পারি ফিরতে না পারি এগুতে। অভিমানে হতাশায় চোখে জল ভরে আসে। ওগো অনন্ত লীলাময়! তুমি তো রয়েছ এই মনের গহনেই, কিন্তু জেনেও যে খুঁজে নিতে পারি না। তাই তো

দিশাহারা হয়ে ঘুরে মরি দিকে দিকে! এবার অনন্ত থেকে সান্ত হয়ে ধরা দাও সীমার মাঝে। মোহাচ্ছন্ন মন এক পা দু পা করে চলতে থাকে আর টলতে থাকে পা। ধীরে অতি ধীরে এগিয়ে চলি পথ।

যা সহজলভ্য তার মূল্য কম। যা সুদুর্লভ তারই জন্য চলে অবিরাম সাধনা। মানুষের চিরবৈচিত্র্যাভিলাষী মন নিত্যনূতনের পূজারী। যাকে সহজে হাতের নাগালে পাওয়া যায়, অচিরেই সে হয়ে যায় অকিঞ্চিৎকর। অনায়াস-লব্ধ বস্তুতে থাকে না তার আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা।

ভগবান তাই অবাঙ্‌মনসাগোচর হয়ে রয়েছেন। নব নব বৈচিত্র্যের মধ্যে তাঁর অভিব্যক্তি। মানবযাত্রী চলেছে সেই দুর্জ্ঞেয় বস্তুর সন্ধানে; অপ্রমেয়কে প্রমাণ করবার প্রয়াস তার অসীম। অনন্ত না হয়ে যদি তিনি হতেন সহজলভ্য, তবে দুদিনেই ফুরিয়ে যেত তাঁর চাহিদা।

ভক্ত কবি তাই বলেছেন—

'অনন্ত হয়েছ ভালই করেছ থেকো চিরদিন অনন্ত অপার।
ধরা যদি দিতে ফুরাইয়া যেতে তোমারে ধরিতে কে
চাহিত আর?'

এক ষষ্ঠিতম বৃদ্ধ দুটি ছেলের কাঁধে ভর করে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছেন। হয়তো পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। উনি ছেলে দুটিকে বললেন, "ইনি হয়তো অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এঁকে ডাণ্ডি বা কাণ্ডি করে নেওয়া দরকার।"

ছেলে দুটি বলল, "ইনি অসুস্থ শরীরেই বদ্রীনাথ যাওয়া-আসার সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছেন। আমরা কিছুতেই এঁকে ডাণ্ডি বা কাণ্ডিতে যাবার জন্য রাজী করাতে পারি নি।"

এবার উত্তর দিলেন বৃদ্ধ, "বাবুজী, মেরা বাঁয়া হাথ ঔর

জান্ বহুৎ সাল সে অবশ হো গিয়া। ইসে সে ম্যায় প্রতিজ্ঞা কিয়া, প্যায়দলসে যাকে বাবা বদ্রীনাথজীকো দর্শন করুঙ্গা, নহী তো মৃত্যু কী বরণ কর্ লেগা। ইত্‌নি তথ্‌লিফ্‌সে জীবন কে কোঈ জরুরৎ নহী।"

ষাট বছরের বুড়োমানুষটি সজল বিষণ্ণভাবে এক পা এক পা করে এগিয়ে চলেন।

বৃদ্ধের কথায় অবাক হই। এত অসুস্থ শরীরে কী করে পায়ে হেঁটে এই বৃদ্ধ ওই দুর্গম পথ অতিক্রম করবেন?

মনে পড়ে সেই শ্লোকটি—

'মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তি গিরিম্
যৎ কৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্॥'

॥ ১৫ ॥

ছেলেবেলায় বাবার মুখে শুনেছিলাম এই বদরিকাশ্রমের কথা। দেবঋষিগণসেবিত পরম রমণীয় স্থান নাকি বিশাল বদ্রীনাথপুরী।

আমার শিশুচিত্তে তখনি ঠাঁই নিয়েছিল বদ্রীনাথধাম ভ্রমণবাসনা। আজ দূর থেকে দেখতে পেলাম সেই শৈশব-কাঙ্ক্ষিত কল্পলোক। মেঘলোক ভেদ করে উঠেছে যার তুষার-শুভ্র শিখরচূড়া। সারি সারি শৈলমালার ঊর্ধ্বে দেখা যায় রজতকিরীটি শ্রীশ্রীবদ্রীবিশালার তুঙ্গ শিখরশীর্ষ।

কে সেই শিল্পী? যাঁর নিপুণ হাত এঁকে দিয়েছে নীলাকাশের পটভূমিকায় ওই চিরভাস্বর ধবলিমার মায়া-লোক? কখনও দিক হতে দিগন্তরে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে

নব নব আলোকচ্ছটা! অবাক হয়ে চেয়ে থাকি শৈশবের সেই কল্পলোকের দিকে।

কী অফুরন্ত আলোর ঝরণা! যেন অনাদি সৌন্দর্যের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমাচল। যেখান থেকে সীমাহীন আনন্দ ও সৌন্দর্যতরঙ্গ নিরন্তর উৎসারিত হচ্ছে, তা মানব-চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত বলেই মানুষ প্রত্যয়হীন। বুঝি তারই খানিকটা ওই পাহাড়ের গায়ে ঠিকরে এসে পড়েছে। বিস্ময়ে আনন্দে তাই চিরপথচারী মন ঘুরে বেড়ায় সেই অজানা পথের প্রান্তে কিসের সন্ধানে। 'কী যেন মেলে নাই, কী ধন মেলে নাই।' প্রতি মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে এই তৃষ্ণা এই জিজ্ঞাসাই তাকে এগিয়ে নিয়ে চলে। কোথায় এর শেষ, কী আছে শেষে?

• কী অটল প্রশান্তি, কী নিবিড় আনন্দ এই পাষাণপুরীর তৃণলতাগুল্মে, এই ঝরণাধারায়। গভীর গহন অরণ্যানীর বুক থেকে কেবলি আসে আনন্দলোকের আহ্বান। এই ঘরছাড়া বাঁশীর ডাকেই বুঝি সকলহারা মন সংসারকোলাহল থেকে নির্জন কন্দরে বাঁধে পর্ণকুটির। ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন যিনি, অবিরাম চলে তাঁকেই ধরার সাধনা। উন্মনা মন এক জীবনের প্রান্ত থেকে অন্য জীবনের প্রান্তে ছুটোছুটি করে বেড়ায় তাঁরই উদ্দেশে।

তাই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় উদ্‌গীতি গাথা—আজিও সেই সামগীতির প্রতিধ্বনি শোনা যায় এই পাষাণপুরীর কক্ষে কক্ষে। শোনা যায় নির্ঝরিণী সঙ্গীতে সোঁ—ওঁ—ওঁম্। বিশ্বব্যাপী যত শব্দঝংকার আবর্তিত হচ্ছে, ওঁম্ তারই কেন্দ্রিত প্রতীক। শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েই কেঁদে ওঠে,

ওঁগা ওঁগা ওঁগা। কিন্তু মায়ার বেড়ী যত শক্ত হয় ততই ভুলে যায় সব। তাই সাধক গেয়েছেন—

'এ সংসার ধোঁকার টাটি, কেবল খাই দাই আর মজা লুটি
ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি ॥'

এই মায়ার ছলনায়ই মন ভুলে যায় মায়াতীতকে।

মানুষ যখন পরিপূর্ণ প্রাণের আবেগে এখানে এসে দাঁড়ায়, তখন মনে হয়, কে বলে এ প্রাণহীন পাষাণস্তূপ? এ যে অতীতের বহুস্মৃতিবাহী মহাকালের মৌনসাক্ষীরূপে জীবন্ত হয়ে দণ্ডায়মান। মুনি ঋষি ও মহর্ষিগণের কত মন্ত্র কত স্তোত্র এর কন্দরে কন্দরে প্রস্তরে প্রস্তরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। আজও সেই মৌনবাণী গিরিরাজের নির্জন কন্দরে আকাশে বাতাসে যেন অনুরণিত হয়ে উঠছে। সেই উদ্‌গীথ ঝংকারে ডুবে যায় যত জাগতিক কোলাহল, ডুবে যায় আমি ও আমার স্বার্থদ্বন্দ্বের সংগ্রাম। মন প্রাণ জুড়ে বাজতে থাকে শুধু সুরব্রহ্মের একটি মাত্র ধ্বনি—সোঁ-ওঁ-ওঁম্।

॥ ১৬ ॥

পাহাড়ের আড়ালে ডুবে যায় দিবাকর। সন্ধ্যা আসন্ন। আমরাও হনুমানচটিতে এসে পৌঁছলাম। সামনেই মহাবীরজীর মন্দির। মানুষের ভিড়। দর্শন ও প্রণাম চলছে।

কাছেই ধর্মশালার দোতলায় আমরা একটি ঘরে জিনিসপত্র রেখে বিশ্রাম করছি। কিছুক্ষণ পরই রেন্-কোট-পরা চারটি তরুণ ছেলে পাশের ঘরে এসে উঠল। সঙ্গে একটি ভৃত্য হোল্ডল সুটকেস বয়ে এনেছে।

চটির দোকানগুলিতে আলো জ্বলে উঠেছে। সারি

সারি জ্বলন্ত উনুনে দোকানদারদের চলে রকমারি খাবার তৈরির ব্যবস্থা। পুরী তরকারি গরম জিলিপী দুধ ও চা। কোথাও ফুলুরি আলু-বেগুন সেউভাজা ঝুরিভাজা পাঁপরভাজা ইত্যাদি। যাত্রীদের যার যা রুচি। তা ছাড়া মিঠাই-মণ্ডাও রয়েছে।

পেছনে গঙ্গা। জানলা দিয়ে দেখা যায় গঙ্গাতীরের খানিকটা জমিতে চাষীরা আল বেঁধেছে আলুচারা ও তামাকপাতার।

আহারান্তে দু দলের গল্পসল্প শুরু হয়। ওরা চার বন্ধু ফিরছে বদ্রীনাথ থেকে। এখান থেকে যদিও মাত্র পাঁচ মাইল দূর বদ্রীনাথ, কিন্তু খাড়া চড়াই পথ। মাঝে মাঝে বরফের পাহাড়। বুড়োদের পক্ষে এ পথটুকু হাঁটা খুবই কষ্টকর। তাই বেশীর ভাগ বুড়োরা যায় ডাণ্ডি কাণ্ডিতে, কেউ বা ঘোড়ায়। হেঁটেও যায় অনেকে।

বুড়োমা বলেছিলেন এ পথটায় শীত খুব বেশী, দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। তাই ওই ছেলেদের জিজ্ঞেস করি, "ওখানে শীত কেমন? তোমরা তো পেরিয়ে এলে বরফের পাহাড়, শীতে দম বন্ধ হয়ে আসে নাকি?"

ওরা উত্তর দেয়, "না, আমাদের পক্ষে তেমন কিছু নয়। বরফে শীত তো হবেই। বুড়োমানুষদের পক্ষে এ পথে একটু কষ্ট হবে বইকি! বড্ড চড়াই কি না! কাজেই যাঁরা হেঁটে যাবেন তাঁদের কথা আলাদা। তিন-চার জায়গায় বরফ পাবেন। আমরা তো এই পোশাকেই এসেছি। আপনারা গরম পোশাক ভাল করে পরে নেবেন, তবে আর শীতে অসুবিধে হবে না। একটু বেলা হলে হাঁটতে হাঁটতে শরীর আপনি গরম হয়ে ওঠে।"

"বরফের ওপর চলতে গিয়ে পা স্লিপ করে না তো ?"

"না, বরফে পা স্লিপ করে না। তবে আগে লাঠি দিয়ে দেখে নেওয়া ভাল কতটা ভার সইবে, নইলে বরফে পা ঢুকে যেতে চায়। তাতে জুতো ভিজে যায়।"

হেসে বলেন উনি, "তা না হয় দেখে নেওয়া যাবে, কিন্তু শীতের রাজ্যের মিতালী এই বাতের শরীরে সইলেই হয়।"

"আপনারা একটু বেলায় বেরুবেন। রোদ উঠে গেলে আর শীতে তেমন কষ্ট হবে না।"

বুড়োমা ঘরে এসে বললেন, "ওই জন্যেই তো বলি বাবা, আপনারাও কাণ্ডিতে চলুন। আপনার বাতের শরীর, মায়েরও শরীর খুব ভাল নয়। এ পথটা সবচেয়ে উঁচু, উঠতে কষ্ট হবে খুব।"

উনি বললেন, "তাই তো—"

আমি বলি, "তাইতো টাইতো জানি না, হেঁটেই যাব আমি।"

হাল ছেড়ে দিয়ে উনি বলেন, "বেশ।"

বুড়োমাকে বললাম, "আমাকে এ অনুরোধ করবেন না মা। এতকাল দেহটা খেটেছে সংসারের তাগিদে, এবারে খাটবে সে দেবধাম দেখবার আনন্দে। পায়ে হেঁটে না বেড়ালে এ পাহাড়ী পথে বেড়িযে আনন্দ মেলে না।"

বুড়োমা বললেন, "তা তো বুঝলাম মা জননী, কিন্তু গতবার যে এই পথেই শীতে আমার দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। শেষে কাণ্ডি করে আমাকে নিয়ে যায়। তাই বলছিলাম, তোমরাও চল। এই হনুমান চটিতেই কাণ্ডি মিলবে, নইলে মাঝপথে ভারি মুশকিলে পড়তে হবে কিন্তু।"

পরে ওঁকে বললেন, "আপনি মাকে বুঝিয়ে বলুন বাবা।"

উনি বললেন, "মা যখন বলছেন তুমি না হয় কাণ্ডিতেই যাও। শরীর তো ভাল নয় তোমার।"

হেসে বলি, "আমি তো তবু চলে যাচ্ছি, পায়ের ব্যথায় কাণ্ডি তোমারই দরকার। মাকে তো বলেছি আমার কাণ্ডিতে না যাবার কারণ। তা হলে তিনটে কাণ্ডির কথা নন্দলালকে বলে দিই?"

উনি। না না, কাণ্ডি আমার দরকার নেই। ধীরে ধীরে হেঁটে যাওয়াই আমারও ইচ্ছে।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলি, "বেশ, তা হলে তো কথাই নেই।"

অবশেষে ঠিক হল বুড়োমা ও নাইডু যাবেন কাণ্ডিতে, আমরা হেটে।

আমার গরম পোশাক যা ছিল তাই থেকে মাদ্রাজী মাকে কিছুটা দিলাম। বুড়োমা তুবার এপথে আসায় উপযুক্ত ভাবেই গরম কাপড় এনেছিলেন। ওঁরা কাণ্ডিতে চলে গেলেন। আমরাও রওনা হব হব করছি। নন্দলাল মালপত্তব বাঁধাছাঁদা করছে।

উনি চা খেতে খেতে বললেন, "এই নাকি তোমার গরম পোশাক? মাত্র একটা ব্লাউজ আর র‍্যাপার নিয়ে উঠবে ওই বরফের পাহাড়ে? বুড়োমা বললেন কাণ্ডির কথা, তাতেও রাজী হলে না, শেষে কি শীতে জমে যেতে চাও তুমি?"

অবাক হয়ে জবাব দিই, "এসব বলার মানে কী? কাণ্ডি? সে তো জানই তুমি—হেঁটে যাওয়াই আমার সংকল্প। এতে জমেই যাই আর গলেই যাই। তা ছাড়া যাঁর নামে বেরিয়েছি শেষরক্ষাও তিনিই করবেন। ওই তো কত হিন্দুস্থানী একটা মাত্র চাদর গায়ে দিয়ে পাড়ি দিচ্ছে পথ।"

হতাশভাবে উনি উত্তর দেন, "বেশ, দেখা যাবেখন। তুমি তো আর হিন্দুস্থানী নও। ওরা যা সইতে বা বইতে পারে, পারবে তোমরা ?"

কথায় বেশ অসন্তুষ্টির আমেজ। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সংক্ষেপে বলি, "আচ্ছা দেখো। চল এবারে বেরিয়ে তো পড়ি।"

বেলা সাড়ে সাতটা। রওনার পথে প্রণাম করি মহাবীরজীকে। শক্তি দিয়ো সংকটমোচন, বিপদে যেন মুষড়ে না পড়ি।

হেঁটে চলেছি। ক্রমাগত চড়াই পথ। বুকে হাঁপ ধরে ধীরে হাঁটলেও। যারা উদ্দাম পথিক, তারা ধেয়ে চলে চলার বেগে। আমরা পড়ি পিছিয়ে। বিশ্রাম করে নিই পথের বাঁকে। অন্যান্য যাত্রীর অক্লান্ত চলার ভঙ্গী দেখে মনে হয়, না, আর বসে থাকা নয়। ভারী পা দুটোকে টেনে নিয়ে আবার শুরু হয় পথ চলা। রোদ উঠেছে। সাদা বরফের উপর চিকচিক করছে সেই আলোর বন্যা। পেরিয়ে যাচ্ছে ডাণ্ডি-কাণ্ডির যাত্রীরা। আমরাও ধীরে ধীরে পেরিয়ে চলি সেই তুষারমেরুর ধবলপথ।

বেলা বেড়েছে। প্রখর রোদ। অনবরত পথশ্রমে পিপাসায় ওঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। এবারে আরও খাড়াই পথ। একটু বসে দম নিয়ে আবার হাঁটা দেব। উনি জলের জন্য হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, "এই যা, ফ্লাস্কটা তো সঙ্গে নেই—কোথায় যেন ফেলে এসেছি।" একটু বসে বললেন, "তুমি ধীরে ধীরে এস। দেখি আমি কোথাও জলের সন্ধান পাই কিনা।"

বেশ খানিকটা ওঠার পর দেখি একখানা প্রকাণ্ড পাথরের

উপর উনি বসে, মুখে লেগে আছে তৃপ্তির হাসি। আমি যেতেই বললেন, "যা তেষ্টা পেয়েছিল। চমৎকার জলটা। তুমিও খেয়ে নাও।"

জিজ্ঞেস করি, "এখানে কোথায় পেলে জল?" বলার সঙ্গে সঙ্গেই দেখি একটি আট-ন বছরের মেয়ে এক ঘটি জল নিয়ে দাঁড়িয়ে।

"তুম্ ভী পানী পিলো মাঈজী। পিয়াস লাগ্ গিয়া নহীঁ?" মেয়েটির দরদভরা মিষ্টি কথায় মন ভোলে। ওর টুকটুকে সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে ভাবি তৃষিতের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য পর্বতগৃহ ছেড়ে এসেছেন কি পার্বতী? এখানে তো জল পাওয়া সম্ভব ছিল না কোনমতে!

সাগ্রহে ওর হাত থেকে ঘটিটি নিয়ে ঢকঢক করে জল খেলাম। পিপাসার জন্য হোক বা যে কারণেই হোক, জলটা অত্যন্ত সুস্বাদু লাগল। ঘটিটাও ঝকঝকে বাইরে ভেতরে। ঘটি ফিরিয়ে দিই ওকে, সঙ্গে কিছু পয়সা। খুশীতে ভরে ওঠে কচি মুখখানা।

জিজ্ঞেস করি, "তোমার নাম কি?"

হাসিমুখে উত্তর দেয়, "মেরী নাম শিউরাণী।"

চলে যায় ওর শিলাকক্ষের অভ্যন্তরে। পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে করে নিকানো ঘর, একপাশে একটি জলের কলসী। একটি ছোট ছেলে খেলা করছে সেখানে। শিউরাণী বসে থাকে তার ভাইটিকে কোলে নিয়ে—শিখর-শিলা ছাউনিতলে মায়ের প্রতীক্ষায়।

তার বাপ মা গেছে কোন্ দূরে কাজের জন্য। এই পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। মেয়েরাও ছেলের মত অক্লান্তভাবে কাজ করে যায়। মেয়েরা ভারী ভারী

বোঝা সব বয়ে নিয়ে আসে নীচ থেকে। কপাল আর কপোল বেয়ে ঘাম ঝরে দরদর করে অত শীতেও। টুকটুক করে গাল দুটি আতপতাপে। ওরা পরে ঘাগরা ও লম্বাহাতা জামা। রূপোর গয়না, প্রবালের মালা। নাকে বড় বড় নথ ও কানে সারিবন্দী রিং। অসম্ভব পরিশ্রমী জাত এই পাহাড়ী নারী ও পুরুষ। কঠিন পাষাণের বুকে ফলায় এরা সোনালী ফসল।

এই পাষাণপুরীর অভ্যন্তরে যতই এগিয়ে চলেছি ততই মনে হচ্ছে কোন্ এক দুর্নিবার অদৃশ্য শক্তি কেবলই টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোন্ এক অজানা রহস্যলোকের দিকে।

যখনই ক্লান্তি আসে, পাহাড়ী মিষ্টি হাওয়া জুড়িয়ে দেয় শরীর—চলার নতুন উৎসাহ আসে। গুনগুনিয়ে গেয়ে ওঠে মন অলোকের আনন্দগান—'চলো যাত্রী চলো দিনরাত্রি কর অমৃতলোক পথ অনুসন্ধান।'

তিনবার বরফের উপর দিয়ে পাড়ি দিলাম। তুঙ্গ-তুষারমালার শোভা অনির্বচনীয়। কোথাও শুভ্র তুষার-বক্ষ ভেদ করে অন্তঃসলিলা ধারা বেরুচ্ছে একটি কলকল ছলছল শব্দে। যেন মাতৃঅঙ্কে সদ্যজাগ্রত শিশুমুখে ফুটে উঠেছে কলহাস্যধ্বনি!

শ্যামশষ্পদলে ফুটেছে নানা রঙের বিচিত্র কুসুমসম্ভার। গঙ্গার উপর পুল পেরুতে তুলে নিই ফুল। অঞ্জলি দিই জাহ্নবী জলে।

বদ্রীনাথপুরী

॥ ১৭ ॥

এবারে এসে গেছে শ্রীশ্রীবদ্রীনাথের রাজধানী। সমতল পথ। হাঁফ ছেড়ে ধীরে এগুতে থাকি আশান্বিত মনে। বেশ দূর থেকেই দেখা যায় চতুর্দিকে পাষাণপ্রাকার পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিতে শ্রীশ্রীবদ্রীনাথ ধাম। দলে দলে যাত্রীদল চলেছে 'জয় বাবা বদ্রীবিশালা কী জয়' বলে।

এই সেই পুরাণবর্ণিত বহুজনবিশ্রুত বদ্রীনাথপুরী। শ্রীশ্রীবদ্রীবিশালার বিশাল সৌন্দর্যের বিচিত্র লীলাভূমি। এরই নাম তীর্থরাজ।

মন্দিরপাদদেশে উদ্দাম বেগে ছুটে চলেছে অলকানন্দার গভীর জলধারা, আর তারই সঙ্গে মিশেছে এসে ঋষিগঙ্গাও। কোথাও সেই স্বচ্ছনীলাভ অল্প জলে দেখা যাচ্ছে নানা রঙের নুড়ি—সাদা কালো বাদামী ও সোনালী। অলকানন্দার পুলের ধারে নামধাম লেখার জন্য লোক থাকে। সেখানে যথাক্রমে নিজের পরিচয় জানিয়ে চলে যাই ওপারে। নীচে সারি সারি দোকানপাট পোস্ট-অফিস ও টেলিগ্রাফ অফিস। তারই একটু উপরে পাণ্ডার আবাসগৃহ ও যাত্রীনিবাস।

আমাদের পাণ্ডা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টের যাত্রীনিবাসের দোতলায় আমরা উঠলাম। বেলা তখন এগারোটা। বুড়োমা ও নাইডু পৌঁছেছেন অনেক আগেই। আমাদের দেখে ওঁরা খুশী হয়ে উঠলেন। বুড়োমা বললেন, "যাক, আপনারা এসে পড়েছেন। আমরা তো ভাবছিলাম এ বেলা আর মন্দিরে যাওয়া হবে না। বারোটায় মন্দির বন্ধ হয়।"

সবাই চললাম তপ্তকুণ্ডে স্নানের জন্য। পাণ্ডাজী তাড়াতাড়ি সবাইকে সেদিন স্নানদানাদি সংক্ষেপে সারিয়ে দিলেন—নইলে দেবতাদর্শন সে বেলা আর হবে না। তীর্থ-রাজ বহ্নিক্ষেত্র থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে চলেছি। কোন কোন যাত্রী মন্দিরের প্রতি ধাপে ধাপে প্রণতি জানিয়ে এগিয়ে চলেছে।

মন্দিরমধ্যে যেখানে বদ্রীবিশালজী বিরাজিত সেখানে জনগণের প্রবেশ নিষেধ। বহির্মণ্ডপ থেকে দেবতাদর্শন করতে হয়। মন্দিরাভ্যন্তর আবছা আঁধারে ঢাকা। তার মধ্যে ভুলে চশমা বাসায় ফেলে এসেছি, সুতরাং বাইরের অচল দৃষ্টিতে আর্ত মন ব্যথায় অভি মানে ভারী হয়ে ওঠে—কী করে দেখব তোমায়, কেন এমন অন্ধকারে বিলীন হয়ে আছ তুমি ?

মানসলোকে মূর্ত হয়ে ওঠে বদ্রীনাথের সেই শঙ্খচক্রগদা-পদ্মধারী মনোহারী রূপ।

এই বদরিকাশ্রম সম্বন্ধে কিংবদন্তী শোনা যায় নানারকম এর সঠিক কাহিনী জানতে চাইলে পাণ্ডারা সংক্ষেপে বলে থাকেন—একদা এখানে বদরিবৃক্ষতলে নররূপী নারায়ণ লোকশিক্ষার্থে এই উত্তরাখণ্ডে তপস্যা করেছিলেন, তাই এর নাম বদরিকাশ্রম বা নরনারায়ণাশ্রম ইত্যাদি দু চারটি কথা।

পৌরাণিক উপাখ্যানে আছেঃ একদা দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে তিনি দেখতে পেলেন একটি বদরিবৃক্ষতলে নররূপী নারায়ণ পদ্মাসনে ধ্যানে মগ্ন।

নারদ বিস্ময়ে ভাবতে লাগলেন—যিনি ত্রিলোকের অধিপতি তিনি কার ধ্যানে বসেছেন !

নারায়ণ যখন ধ্যানভঙ্গে চোখ মেলে চাইলেন নারদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রভু, সমগ্র জগৎবাসী যাঁর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় নিরন্তর ধ্যানধারণায় রত, তিনি আজ কার দর্শনপ্রার্থী হয়ে ধ্যান করছেন ? এ অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় ! যাঁর অপ্রাপ্য কিছুই নাই, কী তাঁর ঈপ্সিত বস্তু থাকতে পারে যার সাধনায় তিনি আজ তপোমগ্ন ?'

স্নিগ্ধকণ্ঠে নারায়ণ নারদকে বললেন, 'বৎস, কলিযুগ আগত। আমি আর মনুষ্যদেহে অবতীর্ণ হব না। কারণ মানুষ তখন আত্মসুখে মত্ত হয়ে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য ধ্যান-ধারণা বা তপস্যার অনুগামী হতে চাইবে না। অতি অল্প লোকেই তখন আমাকে চিন্তা করবে বা জানতে চাইবে। পরিপন্থী দল তাদের কাজে প্রবল বাধারও সৃষ্টি করবে। আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষ তখন পরমার্থলাভের চেষ্টায় বিরত থাকবে। পরন্তু নিজ শক্তির দম্ভে হিংসাদ্বেষে লিপ্ত হয়ে পুরুষকারবোধে গর্বিত হয়ে উঠবে।

তাই তাদের মনে আত্মজ্ঞানলাভের দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যই আমার এই নরদেহে ধ্যানমগ্ন অবস্থা—যাতে তারা ধ্যান-ধারণার পথে যথার্থ আত্মস্বরূপ জ্ঞাত হয়ে অসত্যবস্তু হতে নিবৃত্তিলাভ করে—সত্যবস্তু লাভে সমর্থ হয়। নারদ! তুমি এই বাণী যথাসময়ে জগৎবাসীর নিকট বিবৃত করবে।'

এই কথা বলে নারায়ণ সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন। সেই থেকে ভগবানের নরদেহ শীলামূর্তিতে রূপান্তরিত হল। একে নারদীয় ক্ষেত্র বা বদরিকাশ্রমও বলা হয়। আবার মতান্তরে বাদরায়ণ ঋষির নামানুসারে নাকি একে বদরিকাশ্রম বলা হয়।

বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীগণ এই শিলামূর্তিকে নারদকুণ্ডে

বিসর্জন দেয়। অতঃপর যখন শ্রীমৎশঙ্করাচার্য এই উত্তরাখণ্ডে আগমন করেন, তখন একদিন তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হন, 'বৎস, আমি বৌদ্ধগণ কর্তৃক নারদকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে দীর্ঘদিন এখানে অবস্থিতি করছি। তুমি আমাকে যথাস্থানে রক্ষিত কর।'

এই দেবাদেশে তিনি এক শিষ্যসহ এই শিলামূর্তির পুনরুদ্ধার করে উত্তরাখণ্ডের বদরিকাশ্রমে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তা নারদকুণ্ড থেকে তুলে এনে তপ্তকুণ্ডের কাছে গড়ুরগুহায় রাখা হয়। এর পর গাড়োয়ালরাজ ও রাণী অহল্যাবাঈ কর্তৃক এই মন্দির নির্মিত হলে সেখানে এই বিগ্রহ স্থাপন করা হয়।

বৈশাখী অক্ষয়তৃতীয়ায় বদ্রীনাথের দরজা খোলা হয়, আশ্বিন মাস পর্যন্ত খোলা থাকে। আর ছ মাস থাকে মাঠঘাট মন্দির সব তুষারাবৃত।

যিনি এই বিগ্রহপূজারী হবেন তাঁকে হতে হবে চির-কৌমার্যব্রতী সন্ন্যাসধর্মাবলম্বী। মন্দির যখন বরফে ঢাকা থাকে তখন বদ্রীনাথের উদ্দেশে যোশীমঠে পূজো হয়।

॥ ১৮ ॥

পরদিন খুব ভোরে তপ্তকুণ্ডে স্নান, গুপ্তদান, ভোজ্যদান, গঙ্গাপূজা প্রভৃতি সেরে পাণ্ডাজী আমাদের নিয়ে গেলেন মন্দিরে। খুব একটা ভিড় ছিল না তখন, কাজেই বেশ ভাল করে দেবতাদর্শনের সুযোগ ঘটে গেল।

শ্রীশ্রীবদ্রীনাথের তখন মুখ ধোওয়া হচ্ছিল, তারপর বাল্য-ভোগারতি। ওখানের দেবার্চনার পূজাপদ্ধতি এ দেশীয়

প্রথায় নয়। যাত্রীদের দেওয়া কোনও পুষ্পাঞ্জলি কিংবা মিষ্টান্নাদি ভোগনৈবেদ্যের ব্যবস্থা নেই।

বদ্রীনাথের উদ্দেশে যাত্রীগণ তাই শুধু কাঁচা ডাল চাল শুকনো মেওয়াফলই ভেট চড়াতে পারে। তাও পাণ্ডাদের হস্তগত হতেই দ্বারপ্রান্তে একটি পাত্রে ওই সব ঢেলে দেয় এবং তক্ষুনি ওই পাত্রের ভেতর থেকে 'এই লো'—বলে পাণ্ডারা একমুঠো ওই ডাল চাল মেওয়াফল ও কিছু তুলসীপত্র যাত্রীদের দিয়ে দেয়।

দেবতার উদ্দেশে যাত্রীরা নিয়ে আসে ধুতি উড়ুনি। পাণ্ডারা তা একধারে স্তূপ করে রাখে সব। কেন না, এখানে বদ্রীনারায়ণের যে আদিমূর্তি তা শীলাগাত্রে মিলিয়ে যাওয়া অস্পষ্ট মূর্তি।

বদ্রীনাথের মন্দিরের অদূরেই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দির। সেখানে গিয়ে পাণ্ডাজীকে অনুরোধ জানাই মা লক্ষ্মীকে আমাদের আনা শাড়িখানায় সাজিয়ে দিতে। পাণ্ডাজী শাড়িখানা দিয়ে মায়ের মূর্তি ও বেদী ঘিরে দিলেন। মনটা তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। প্রসাদ ও চরণামৃত নিয়ে চলি ঘরের দিকে।

পাণ্ডারা সকাল থেকেই মন্দিরের উঠোনে হাঁক দিতে থাকে—"আজ ভোগকা রুপেয়া জমা দেনেসে কল্ ভোগ মিল যায়েগে। কল্ জমা দেনেসে পরস্যু ভোগ মিলেগা।"

অর্থাৎ দুপুরে শ্রীশ্রীবদ্রীনাথের যে অন্নব্যঞ্জন ভোগ দেওয়া হয়, সে জন্য আগের দিন পাঁচ টাকা জমা দিলে তাকে ভোগের প্রসাদ দেওয়া হবে।

মন্দিরের সামনে বসে থাকে ভিখিরীর দল। যাত্রীরা যে যার সাধ্যমত ওদের ডাল চাল পয়সা দেয়। ওখান থেকে

ডানদিকে এগিয়ে গেলে অলকানন্দার পারেই ব্রহ্মকপাল নামে একটি জায়গায় যাত্রীরা স্বর্গীয় পিতৃপুরুষদের আত্মার সদ্‌গতি কামনায় এখানে হোম তর্পণ ও পিণ্ডদান করে থাকে। পিণ্ডদানের এটিই সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা।

প্রথম দিন মন্দির থেকে ফিরে ক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসার্ত দেহে বসে আছি। অজানা জায়গা। পাণ্ডাজীকেই আমাদের জন্য যা হয় কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে দেবার কথা ছিল। বুড়োমা ও নাইডু পথশ্রমে শুয়ে পড়েছেন।

উত্তরের হিমেল হাওয়া হুহু করে খোলা জানলার ভিতর দিয়ে ঢুকছে। শীতে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে জানলাটা বন্ধ করে দিই। একখানা বই নিয়ে বসি, উনিও লেপমুড়ি দিয়েছেন।

একটু পরেই পাণ্ডাজীর লোক এসে বললে, "আপনারা সবাই নীচে চলুন। খাবার দেওয়া হয়েছে।"

উনি বুড়োমা নাইডু সবাই মিলে নীচে নেমে আসি। আমরা যেতেই পাণ্ডাজী হাসিমুখে একটি তক্তাপোশে আমাদের বসতে বললেন। ওই ছেলেটি পেতে দিল চারখানা আসন ও গ্লাস, তারপর নিয়ে এলো চারখানা বড় থালায় সাদা ঘি-ভাত, আদাকুচি ভাজা, শাকভাজা, আলুর দম, টক ডাল, পাঁপরভাজা, চাটনি ইত্যাদি। আমাদের খেতে বসিয়ে পাণ্ডাজী নিজের হাতে পরিবেশন করলেন ভোগের প্রসাদ পর্যাপ্ত পরিমাণে। কলির জীবের অন্নগতপ্রাণ জেনেই এই দুর্গম শৈলশিখরেও বদ্রীনাথ তাদের জন্য আকণ্ঠ ভোজন ব্যবস্থা করে রেখেছেন। স্থানমাহাত্ম্যে সে অন্ন যেন অমৃততুল্য মনে হয়।

হাত মুখ ধুয়ে উপরে চলে আসি। পাণ্ডাজীর লোক দিয়ে

গিয়েছিল পুরু কাশ্মীরী গালিচা ও চারখানা নতুন লেপ। যে যার বালিশ নিয়ে লেপমুড়ি দিয়ে দিব্যি আরামে শুয়ে পড়লাম। শ্রান্ত দেহটাকে কে যেন কোমল হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছিল। তন্দ্রাচ্ছন্ন মন ভাবছে যত ভয় যত সংশয় আজ তার অবসান। আজ সে তীর্থরাজধামে উপনীত, আজ সে সিদ্ধকাম। ভিতরের সেই আমি বলে ওঠে—নাঃ শরীরটা এখনও নেহাতই ভোগবিলাসের অধীন। সর্বস্ব ছেড়ে সর্বেশ্বরকে লাভের কথা এই মনের বহুদূর। তাই না পথের কষ্টে খাচ্ছিলাম হিমসিম, আর এখন দিব্যি আরামে ঘুমে জড়িয়ে আসে দু চোখ।

আড়ালে দাঁড়িয়ে তাই ভগবান দেখছেন দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করে মানুষ একাগ্রভাবে তাঁকেই পেতে চায়, না দৈনিক আরামবিলাসের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চায়। যে ক্ষণিক ইচ্ছা মনকে করে উন্মনা, তা যখন নিরবচ্ছিন্ন অতন্দ্র মনের ব্যাকুল অভীপ্সায় পরিণত হয় তখনই মনোময় ধরা দেন মনের মণিকোঠায়। তাই সাধুবাবা বলেছিলেন, ‘সে তো অনায়াসলব্ধ বস্তু নয় মা।’

যদিও পার্থিব দৃষ্টিতে আমাদের নিকট দেবতার স্বরূপ প্রকটিত হয়ে ওঠে না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে অনুভব করি তাঁর দুর্নিবার আকর্ষণ। পার্থিব জগতে লাভ করি তাঁর পরম প্রসাদ। অজানা জায়গায় আসতে আসতে যখনই বুক ধুকধুক করছিল—কেমন করে যাব ওই অজানা পথে, এ রুগ্ন দুর্বল শরীরে বদ্রীনাথধাম পৌঁছতে পারব কিনা, মনে যখনই জেগেছে সংশয়, তখনই দেখতে পেয়েছি সকল বিধানই তিনি শরণার্থীর জন্যে করে রেখেছেন।

সন্ধ্যায় আসেন এক পূজারী, হাতে দীপশিখা। আমাদের

কাছে এগিয়ে এসে বলেন, "লে লো মাঈজী, লছমীজীকা দীয়া, তেরা ভাণ্ডার অক্ষয় হোগা।"

কিছু প্রাপ্তির আশা। সবাই নিয়ে নিই দীপশিখা। কিছু পয়সা দিতেই চলে যান পূজারী ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ জানিয়ে।

একজন চলে যেতেই ঘটে আর একজনের আবির্ভাব। এমনি যে পূজারীরা আসেন তাঁদের কারুর হাতে থাকে নারায়ণজী, কারুর গণেশজী, কারুর হাতে কুবের ও গড়ুরজীর ছোট ছোট মূর্তি ও পঞ্চপ্রদীপ শিখা। তাঁরাও চলে যান একে একে আশীর্বাদ জানিয়ে দক্ষিণা নিয়ে।

রাত্রি আটটায় শ্রীশ্রীবদ্রীনাথের শৃঙ্গার অভিষেক, সহস্র নামাবলী কীর্তন ও ভোগ হয়। রাত নটায় শয়ন-আরতি সমাপ্ত।

॥ ১৯ ॥

হরিদ্বার থেকে কেদার-বদ্রীনাথধাম পর্যন্ত সওয়া লক্ষ পর্বতশ্রেণী ও চুরাশী লক্ষ মন্দির বিরাজিত। বদ্রীনাথপুরীতে পৌঁছে দেখা যায় নীল আকাশের গায়ে চারদিকে ঢেউ খেলে গিয়েছে বিশাল শিখরশ্রেণী—কালো নীল শ্যামল ধবল। স্তরের পর স্তর নিস্তব্ধ লহরীর মালা। আর মাঝখানে খানিকটা সমতলভূমি, তারই মধ্যে স্বর্ণচূড়সমন্বিত শ্রীশ্রীবদ্রী-বিশালার শ্বেতশুভ্র মন্দির। ঘন পর্বতমালার অন্তরালে এই নয়নমনবিস্ময়কারী বদ্রীনাথপুরীর দিকে তাকিয়ে মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য জাদুকরের ইঙ্গিতে একটা উত্তাল তরঙ্গময় সিন্ধু নিস্তব্ধ হয়ে আছে; আর তার মাঝখানে বদ্রীনাথের মন্দির যেন একটি শ্বেত শতদল।

সপ্তমীর চাঁদ আকাশে। তারই আলো পড়েছে অলকা-নন্দার রুপালী ধারায়, বদ্রীনাথের মন্দিরচূড়ায়।

দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েই দেখা যায় মন্দিরটি। জিজ্ঞাসু মন প্রশ্ন করে, ওই পর্বতমালা-পরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য দুর্গেই কি ত্রিলোকাধীশকে সুরক্ষিত করে রেখেছে মানুষ? ওগো বিশ্বপতি, কোথায় তোমার অবস্থিতি? এই তুহিন-মেরু অন্তরালে পাষাণকক্ষে, না ক্ষীরোদ সমুদ্রের অতলে অনন্তশয্যায়? মন্দির কি সিন্ধুজলে কোথায় আছ তুমি? তাই মুমুক্ষু জন দিশাহারা হয়ে ঘুরে মরে জীবনের ঘাটে ঘাটে। পৃথিবীর জল স্থল অন্তরীক্ষ সর্বভূতে যার পরিব্যাপ্তি, তবু সে ধরা ছোঁয়ার নাগালের বাইরে। বিশ্বমনোচোরের এই নিরন্তর লুকোচুরির ছলনাতেই মানুষের জীবনভোর চলে অন্বেষণ—সে কোথায়? বেদে বারবার এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হয়েছে—

'কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি?'
এমন কী আছে যাঁকে জানলে সব জানা যায়, যাঁকে পেলে সকল চাওয়া-পাওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটে? এই জীবনজিজ্ঞাসার ক্রমবিবর্তনেই ছুটে চলেছে মানবযাত্রী জন্ম হতে জন্মান্তরের পথে। সে কোথায়? বেদান্ত আবার এও বলেছেন—

'ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥'

কেবল তখনই সকল সন্দেহ ভঞ্জন হয়, সমস্ত তমসা-জাল ছিন্ন হয়ে যায়, যখন অন্তরস্থ পরমসত্যকে উপলব্ধি করা যায়।' এবং ব্রহ্মের এই স্বরাট্ পরিব্যাপ্তিতে ঘটে সকল বাসনা কামনা ও দুঃখের অবসান। বেদান্তের এই মহাবাণীই তখন চিত্ততন্ত্রীতে অনুরণিত হয়—

'ন মৃত্যু র্ণ শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ণ মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥
নং পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদার্ণযজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং ॥'

এই তো গেল অদ্বৈতবাদীর অখণ্ডানুভূতি। চিনি ভেবে ভেবে হয়তো তাঁরা চিনিই হয়ে চান। আর দ্বৈতবাদী চায় সেই পরম রসস্বরূপের রস প্রাণ ভরে আস্বাদন করতে, অর্থাৎ চিনি না হয়ে চিনি খেতে। তাই তাঁর মনে জেগে থাকে বিরহিণী রাইয়ের বিরহপাথার। অন্তরের অন্তরালে খুঁজে বেড়ায় সে সেই পরম প্রিয়তমকে। তারই আভাস পাই বিশ্বকবির গানে—

'তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে কত আর সেতু বাঁধি
সুরে সুরে তালে তালে।'

এই যে নিত্য সুরে তালে দোলা দিয়ে যায়, ছুঁয়ে যায় অলক্ষ্যে মন; কিন্তু ধরা তো দেয় না সে। বিরহের দুঃখভারে ভারী হয়ে ওঠে জীবন। নিজেকে সেই প্রিয়তমের পায়ে উৎসর্গের জন্য অধীর প্রতীক্ষায় চেয়ে থাকে ভিখারী-হৃদয় সকল দুঃখের প্রদীপ জ্বেলে পথের দিকে—জীবনের শেষ পূজা সমাপ্তির আশায়।

"মাঈজী"—

ছিঁড়ে যায় মনের নিভৃতে জালবোনা। চেয়ে দেখি পেছনে নন্দলাল দাঁড়িয়ে।

"ক্যা বাত্ নন্দলাল ?"

"বাবুজী আপকো বুলা রাহেঁ হ্যাঁয়।" উত্তর দেয় নন্দ।

তাড়াতাড়ি ঘরে চলে আসি। দেখি আমাদের পাণ্ডাজী এসেছেন। তিনি আজই সুফল প্রদান করবেন। কেন না আমরা আগামীকাল ভোরের দিকে রওনা হব। পাণ্ডাজীকে বসতে আসন দিয়ে আমরা সবাই পাশাপাশি বসলাম একখানা শতরঞ্জি বিছিয়ে।

পাণ্ডাজী একখানা থালায় করে তুলসী পুষ্পচন্দন ধান্য হরীতকী প্রদীপ এবং গণেশ ও বদ্রীনাথজীর দুখানা তামার মূর্তি এনেছেন। আমাদের হাতে জল দিলেন, আচমনান্তে প্রথমে গণেশপূজা—

'নমস্তে সর্ব্বসিদ্ধিদং গণেশং শঙ্করাত্মজং।
শরণ্যং সর্ব্বকার্য্যেশং শিবানাং শিবকারণম্॥'

এবারে শ্রীশ্রীবদ্রীনাথের পায়ে অঞ্জলি দান—

'বদরীনাথ বিশ্বাত্মন্ বিঘ্ননাশায় মে প্রভো
ভগবৎক্ষেত্র দেবেশঽস্মিন্ ভগবদ পাদার্চ্চনম মহ্য।'
'বদরীনাথ বিশ্বাত্মন প্রভো বিঘ্নবিনাশন
পুণ্য তীর্থক্ষেত্রে আজি পূজি তব শ্রীচরণ।'

অতঃপর বদ্রীনাথধামের ব্যাখ্যা ও অন্যান্য স্তবাদি পাঠ করে আমাদের হাতে মেওয়াফল তুলসীপত্র প্রভৃতি বদ্রীনাথের প্রসাদ ও আশীর্বাদ দিলেন, আর দিলেন মাথায় শান্তিজল। আমরাও দেবতা ও পাণ্ডাজীকে প্রণাম করে প্রণামী দিই। এই দান যে যার আত্মতুষ্টির জন্য যথাশক্তি করে থাকে। পাণ্ডাজীকে প্রণাম করতেই তিনি স্বস্তিবাণী জানালেন—'ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।'

ভোর হতেই তপ্তকুণ্ডের দিকে ছুটলাম। স্নান সেরে সোজা মন্দিরের দিকে যাই। দরজা খোলাই ছিল, দু-চারজন যাত্রী। দেবতাদর্শন ও প্রণাম চলছে।

'চৈতন্যং শাশ্বতং শান্তং ব্যোমাতীতং নিরঞ্জনং
বিন্দুনাদকলাতীতং তং নমামি শ্রীজগৎগতিম্ ॥'

বুড়োমা ও নাইডু দাঁড়িয়ে আছেন একপাশে; বিদায়ব্যথায় চোখে জল।

আমি নির্বাক মনে ওই দেবমূর্তির দিকে তাকিয়ে ভাবছি, একদিন তুমি এখানে নররূপে আবির্ভূত হয়েছিলে আর আজ এই শিলারূপ! আর কি কখনও স্বরূপে প্রকটিত হয়ে উঠবে না প্রভু? মানুষের মনের গহনে স্বপনচারী হয়েই 'কি চলে তোমার খেলা?

মন্দির থেকে বেরিয়ে দুধারের দোকানপাট পোস্ট আফিস সব পেরিয়ে উঠি গিয়ে সোজা পাণ্ডাজীর ঘরে। বুড়োমা ও নাইডু সবার কাছে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে রওনার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। উনি আর আমি পাণ্ডাজী ও তাঁর গৃহিণীকে প্রণাম করি।

উনি পাণ্ডাজীকে বললেন, "আপনাদের এই আদর যত্ন ও সেবাপরায়ণতা অভাবনীয়। বুড়োমার কাছে আপনাদের পরিচয় পেয়ে বিনা দ্বিধায় আমরা এখানে উঠেছি। আপনাদের এই অমায়িক ব্যবহার ভোলবার নয়।"

উত্তরে বিনীত কণ্ঠে পাণ্ডাজী বলেন, "এ তো আমাদের কর্তব্য কাজ। এই ত্যাগস্বর্গবাসীদের সেবাব্রতই যে পরমধর্ম।"

সত্যি, এই বদ্রীনাথধামবাসীরা অশন-বসনে যথার্থ ই ত্যাগী। এঁদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা অতি অনাড়ম্বর। শীতে ঠাণ্ডাজলে আমাদের হাত পা আড়ষ্ট হয়ে আসে। এই পাণ্ডাজীর ঘর থেকে গরম জলের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিয়েছেন ওঁরা। এবং পাণ্ডাগৃহিণী নিজহাতে যাত্রীদের আহার্যও প্রস্তুত করে দিয়ে থাকেন দরকারবোধে। সেবাই এঁদের পরমধর্ম। তাই এর নাম ত্যাগস্বর্গ। এঁদের কথাবার্তা ও যাত্রীদের প্রতি মমত্ববোধ আন্তরিক। বিশেষ করে এই পাণ্ডাজী ও তাঁর গৃহিণীর।

আর এদিকের পাণ্ডারা? ঢাকায় রাজাবাবুর লক্ষ্মী-নারায়ণের বাড়ি। ঠাকুরদর্শনান্তে প্রণাম করে ফিরছি। দেখলাম দরদালানের একধারে একটি পূজারী ফুলতুলসী নিয়ে বসে। বহুলোকের ভিড়। খাতা দেখে গুনে গুনে জোড়া তুলসী দিচ্ছিলেন সবাইকে। সাগ্রহে আমিও হাত পাতি। কিন্তু আমি একটি চরণতুলসী চাইতেই বললেন, "নাম কি? তোমার টাকা জমা দেওয়া হয়েছে?"

তুলসীর জন্য টাকা জমা দিতে হয় জানতাম না। বললাম, "না, তুলসীর জন্য টাকা জমা দিতে হয় এতো আমি জানি না!"

বিরক্তভাবে বললেন উনি, "তবে আর কি। আজ পূর্ণিমা তিথির চরণতুলসী তারাই পাবে যারা টাকা জমা দিয়েছে।"

আজ পূর্ণিমা তিথি—শুধু হাতে ফিরবো? ওই তো পূজারীর নিকটে স্তূপীকৃত হয়ে আছে কত ফুল কত তুলসীপাতা। দুর্বল মন তাই আবার অনুরোধ জানায়

পূজারীকে, "অনেক তো ফুল রয়েছে, ওই থেকে দিন না একটু আমাকে।"

এবার সগর্জন উত্তর এলো: "বিনা জমায় চরণতুলসী মিলবে না। এই নাও ফুল—যত্তো সব।" বলে অবজ্ঞাভরে শুধু একটি পদ্মফুল ছুঁড়ে মারলেন ভিড়ের মধ্যে আমার দিকে। ফুলটি তুলে মাথায় ঠেকিয়ে বাড়ির পথে চলি কিছু দক্ষিণা দিয়ে।

আহত অভিমানে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। অতগুলো লোকের সামনে এমনি ভৎর্সনা না করলে কি চলত না পূজারীঠাকুরের? এঁদের তিরিক্ষি মেজাজের জ্বালায় ভাবি ঠাকুরবাড়ি যাওয়া ছেড়ে দেব। এ কি শুধু আমার ভাগ্যের পাওনা, না পাণ্ডাদের চিরাচরিত স্বভাব? হয়তো আমারই ভাগ্য। না, আর যাব না ঠাকুরবাড়ি। সেই অবজ্ঞাত মনের কোণে কে যেন বসিয়ে দিল বিদ্যুতের কশা! আরও কি মন্দিরে মন্দিরে ভিক্ষা মেগে ফেরার ইচ্ছা? ঠাকুর তো রয়েছেন মনে, তাঁকে খুঁজে মরিস কেন বাইরে? তারই এই পরিণতি!

বাসায় এসে ফুলটিকে যথাস্থানে রাখতে গিয়ে দেখি, ওই মুদিত পদ্মের মাঝখানে একজোড়া তুলসী। বাইরে থেকে দেখা যায় না একেবারে—পদ্মকোরকের মাঝে লুকিয়ে আছে। পাণ্ডা যদি জানতো এর মধ্যে জোড়া তুলসী তবে কখনোই সে ছুঁড়ে দিত না। যে চরণতুলসীর জন্য এত অনুনয়ের পরিবর্তে মিলল ভৎর্সনা, সে কিনা এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে!

উপেক্ষিত জনের মনের কোণে এমনি অপ্রত্যাশিতভাবেই বুঝি ধরা দেন অন্তর্যামী। দুঃখের পিছনেই দাঁড়িয়ে আছেন দুঃখহারী। কিন্তু মন বোঝে কই?

বিদায়বেলা

॥ ২১ ॥

পাণ্ডাজীর ঘর থেকে বিদায় নিয়ে এসে দাঁড়াই সমতল ভূমিপ্রান্তে। এবার উতরাই পথ—স্বর্লোক থেকে মর্ত্যাবতরণ। বদ্রীনাথপুরী থেকে বিদায়ের লগ্ন ঘনিয়ে আসে, ব্যথায় বিধুর মন।

প্রণাম জানাই দেবধামের উদ্দেশে। প্রণাম জানাই বিগত আগত ও অনাগত মহাপুরুষদের স্মরণে। আজিও এই নিভৃত পর্বতকন্দরে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কত মুনিঋষিগণ বাস করছেন। কত পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণের পবিত্র পদরেণুকণা সঞ্চিত রয়েছে এই শিলাকক্ষের অভ্যন্তরে—গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি তাঁদের উদ্দেশে।

একদিন এই পাষাণপুরীতে অবস্থিতি করেছিলেন নররূপে নারায়ণ। তাই এর আকাশ-বাতাস এত স্নিগ্ধ এত মনোরম এত নিবিড় প্রশান্তি মাখানো। আজ বিদায়বেলায় মনে হচ্ছিল এই পরম শান্তির আশ্রয় ছেড়ে আবার চলেছি সংসারের সেই বহ্নিকুণ্ডে আবর্তিত হতে।

বদ্রীনাথধামের উদ্দেশে যতই উপরের দিকে উঠছিলাম ততই সে যেন দূর থেকে দূরান্তরে সরে যাচ্ছিল। আজ যাবার সময় পেছন ফিরে দেখছি ছুটে আসছে সে পিছু পিছু। উদাসী পথিককে ডাকে,—"ওরে আয়—ফিরে আয়।"

এবারে হাঁটাপথ শেষ। পিপুলকুঠি থেকে আবার শুরু হল বাসে চলা। শ্রীনগর থেকে কীর্তিনগরের বাসে আমাদের মালগুলো চাপিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নন্দলাল।

বাস ছাড়ার সময় প্রায় হয়ে এসেছে। হাতজোড় করে

প্রণাম জানায় নন্দলাল। আশিস জানাই ওকেঃ "তুম আনন্দমঙ্গল মে জীতে রহো বেটা।" নন্দলালকে ওর প্রাপ্য টাকা ও কিছু বকশিশ দিলেন উনি ও বুড়োমা। আর ওর বৌকে দেওয়া হল একখানা শাড়ি। নন্দলালের স্বভাবটি খুব শান্ত ও বিনীত। এই চোদ্দ পনের দিন ও ছায়ার মতই আমাদের সঙ্গী হয়ে ছিল। যদিও পরিচয় অল্পদিনের তবুও ওর মিষ্টি কথা ও ব্যবহারে মনের অনেকটা দখল করে নিয়েছিল। আজ যখন সে বিদায় নিয়ে চলে গেল মনে হল যেন কত আপনার জন ছিল ও আমাদের।

হর্ন দিয়ে মোটর তার চলার পথ ধরল। চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে লোকজন বাড়িঘর, দোকানপসার। সবাইকে মন বলছে, বিদায় বিদায়। ওরাও যেন বিদায় জানিয়ে বলছে, আবার এসো।

রাত প্রায় একটায় পৌঁছলাম হৃষীকেশ। অত রাত্রে অন্য কোথাও না গিয়ে আমরা ও কয়েকজন যাত্রী বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছেই উন্মুক্ত একটি চাতালে রাতটা কাটিয়ে দিলাম। বাসের ঝাঁকুনিক্লান্ত শরীর ঘুমে এলিয়ে পড়ে।

আবার ভোরে উঠে বিছানাপত্র গুটিয়ে যে যার চলার পথে পা বাড়াই। এবারে নাইডু যাবেন ভারত সেবাশ্রমে, সেখান থেকে চলে যাবেন বম্বেতে।

আর আমরা ও বুড়োমা আপাততঃ হরিদ্বার, তারপর দেরাদুন মুসৌরী ঘুরে যাব কলকাতা। সেবাশ্রমে যাবার আগে নাইডু আমার হাতখানা ওঁর বুকে চেপে ধরে বললেন, "তুম মেরী লছমীমাঈ, ভেইয়া মেরা নারায়ণজী হ্যায়। তুমহারী আনন্দমঙ্গল মে মেরা বহুৎ খুশী হ্যায়। ইয়ে দুনিয়ামে যেতনা রোজ রহুঙ্গী, তুমহারী প্রেম ঔর প্রীত্ কভী

ন ভুলুঙ্গী।” চোখ দুটি ছলছল করে ওঠে এই মাতৃসমা মহিলার!

বৃদ্ধার বিদায়বেলার অশ্রুসজল মুখের দিকে চেয়ে একটা না-বলা ব্যথায় আমার মনটাও কেমন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

বললাম, “মাতাজী, ম্যায়ঁ তুমহে ভী কভী নহী ভুল সক্‌তি। তুমহারে প্রেম ঔর স্নেহ হমেশা য়্যাদ বনা রহেগী।”

উনি টাঙ্গার জন্য বাইরে গেছেন। বুড়োমায়ের কাছ থেকেও বিদায় নিলেন নাইডু। চোখ দুটি মুছে ঝোলা ও লাঠিটি হাতে তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে পথচলা শুরু করলেন আশ্রমের দিকে। বৃদ্ধার পরনে একখানা নীল শাড়ি, গায়ে সাদা ব্লাউজ, মাথায় একখানা সাদা তোয়ালে জড়ানো।

যদিও মাত্র কদিনের পরিচিতি, তবু এই ভিন্‌দেশিনীর অকৃত্রিম স্নেহধারা আমার চলার পথকে করে রেখেছিল স্নেহসিক্ত কমনীয়।

পাহাড়ী পথ। প্রচণ্ড রোদে চলতে চলতে নাইডুর সুগৌর মুখ লাল হয়ে উঠত, মুখে কিন্তু লেগে থাকত ওই একটি প্রশান্ত হাসির রেখা। আমরা পিছিয়ে পড়লে অপেক্ষায় থাকতেন পথের বাঁকে। কাছে এলে ওঁর থলি থেকে বের করে দিতেন মিছরি, লজেন্স। বলতেন, “লে লো মাঈ, খা লো।” বলে গুঁজে দিতেন হাতের মধ্যে।

হাঁটতে হাঁটতে নাইডুর পায়ে ফোসকা পড়লে ওষুধ দিতে চাইতাম, বলতেন, “দাওয়াইকা ক্যা জরুরৎ হ্যায়, নারায়ণজী আচ্ছা কর্‌ দেগা।” যখনি কোন চটি বা ধর্মশালায় উঠেছি পাশে পাশে থাকতেন—কীভাবে কতটা সুবিধা আমাদের দিতে পারেন। স্নান হয়ে গেছে, কাপড় ধোব—দৌড়ে এসে একঘটি জল হাতে তুলে দিয়ে বলতেন,

'তুম্ ঘরকে চলা যাও মাঈ, ম্যায় তুমহারী কপড়ে ধো লেতা হুঁ।' শুধু ধোওয়াই নয়, শুকিয়ে গুছিয়ে রেখে তবে শান্তি। এই স্নেহশীলা নারী তার কী যে দরদী অন্তর দিয়ে ঘিরে রেখেছিল মনকে, একমাত্র অন্তর্যামী জানেন। আজ সে চোখের আড়ালে চলে যেতেই একটা বোবা ব্যথা বুকের মধ্যে অনুভব করি। যেন জন্মান্তরের জননী আমার দেখা দিয়ে চলে গেল, আর কোনদিন ঘটবে না তার সঙ্গে দেখা। নিঃশব্দে বিমূঢ় নেত্রে চেয়ে থাকি ওই মমতাময়ীর চলার পথের দিকে।

বুড়োমা আমার অবস্থা খানিকটা আঁচ করে নিয়ে বললেন, "ওই তো তোমার দোষ মা, মানুষের প্রতি দয়া থাকবে, দরদ থাকবে, তাই বলে মোহে জড়িয়ে পড়বে না। ছদিনের দেখা, চলে গেছে, ফুরিয়ে গেছে—তাই বলে আবার মন খারাপ করে বসে থাকা কেন?"

বুড়োমার কথায় সংবিৎ ফিরে আসে, সংযত করি মনকে। বুড়োমার সত্যি মোহনির্মুক্ত মন। সংসারে পুত্রকন্যা নাতিনাতনী আছে সবই—অথচ উনি জড়িত নন কিছুতে। নানা তীর্থে ঘুরে বেড়ান সাধুসন্দর্শন ও পরোপকার করে। আমার মন তো মোহনির্মুক্ত নয়, তাই এই 'কেন'র জবাবে চুপ করেই থাকি।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "কর্তব্য করতে এসেছ মা, যতটুকু দরকার করে যাবে, বাস্। আর একটা কথাই যদি মনে ঘুরপাক খায় তবে অন্য কাজ করবে কখন? ছনিয়ার খেলাই এই—গোটা সংসারটাই যে পান্থশালা। পুত্রকন্যা ভাইবন্ধু কে কার? উঠে পড় মা, উঠে পড়—টাঙ্গা এল বলে।"

মনে ভাবি, সে কথা জানলেও মন মানে কই? আগেও

কেউ ছিল না, পরেও কেউ থাকবে না—তবু যত গোল ওই দিনের জানাজানিতেই তো।

খঞ্জনি বাজিয়ে বাউল গেয়ে চলেছে পথ দিয়ে—

'সংসার মায়া ছাড়িয়ে কৃষ্ণনাম ভজ মন
কৃষ্ণনাম জপরে জপরে জপরে পাবে অমূল্য ধন।'

মনটা যেন জুড়িয়ে যায়। কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি নিয়ত মানবমনকে খণ্ড আনন্দ হতে অখণ্ড আনন্দের দিকে আকর্ষণ করছেন। ওই নামসুধায় যদি নিজেকে ডুবিয়ে দিতে পারি তবে আর সংসারের বন্ধনক্রন্দনে বিকল হয় না মন, জাগতিক দুঃখের ঘটে বিরতি। কিন্তু পারি কই? শুধু অর্থ যশ মানের ধাঁধায় ঘুরে মরি।

উনি টাঙ্গা নিয়ে এলেন। বুড়োমাকে নিয়ে আমরা ধর্মশালায় এসে উঠলাম। আমি সব ঠিক করে রাখছিলাম। বুড়োমা বললেন, "চলুন বাবা, এবারে গঙ্গাস্নানটা সেরে আসি, বেলা বেড়ে যাচ্ছে।" আমাকেও বললেন, "চল মা চল, আর দেরি নয়, এসে সব ঠিক করবখন। কতক্ষণ আর?"

নীলগঙ্গা

ত্রিবেণী ঘাট। পথের দুপাশে সারি সারি দোকানপাট আর মন্দির। কত লোকে ঘাটে ও মন্দিরে মন্দিরে অঞ্জলি দিচ্ছে। আমরা স্নান আহ্নিক সেরে ছাউনির তলায় বসি। বুড়োমা আহ্নিক করছেন। ত্রিবেণীর নৃত্যচঞ্চলা নীলগঙ্গা সহস্রবাহু তুলে ধেয়ে চলেছে। কত পাহাড় কত পর্বত ডিঙিয়ে, নগর-প্রান্তর পেরিয়ে কেবলি এগিয়ে চলেছে সে।

এই যে নিয়ত তরঙ্গদোলার ভাঙাগড়া—এমনি করেই জীবযাত্রী জয়পরাজয় ও উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে খণ্ড হতে অখণ্ড সাগরসঙ্গমে। কখনও বাসনার পাকে তলিয়ে যাচ্ছে অতলে, কখনও আবার ভেসে উঠছে মুক্তির আনন্দে।

ব্যর্থতার গ্লানিই মনে জাগিয়ে দেয় পূর্ণতার অভীপ্সা। তাই জীবনের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে নিত্য চলে তার উত্তরণ। এই অভিযানই তাকে চিরপথিক করে রেখেছে—থামতে দিলে না কোথাও।

চলার তার শেষ নেই। কোথায় শেষ জানে না। শুধু জানে যেতে তাকে হবেই।

অখণ্ড পথের পথিক মানবও এমনি অবিরাম গতিতে ছুটে চলেছে এক জীবন থেকে অন্য জীবনে। সমস্ত জীবনের যা কিছু অর্জন ও সঞ্চয় সে সব পথের পাশে ফেলে দিয়ে নিঃস্ব হয়েই আবার চলতে থাকে। এই অবিরাম আবর্তন সংঘাতেই জাগতিক কামনা কোলাহল থেকে মানবচিত্ত ধাবিত হয় খণ্ড হতে অখণ্ডের দিকে—জীবনের ক্ষুদ্রস্রোত মেশে বিরাটে। মৃত্যুর অসংখ্য তিমিরদ্বার পার হয়ে জীবনের বিরাট মোহানায় এসে যখন সে দাঁড়ায় তখনই দেখতে পায় মৃত্যুর আঁধারপারে নতুন আলোর দ্যোতনা। দূর হয় যত দ্বন্দ্ব ভয় সংশয়। মুমুক্ষু মন বলে ওঠে—

'অসতো মা সদ্গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।'

'হে প্রভো! আমাকে এই অসত্যলোক থেকে সৎলোকে

নিয়ে চল। কামনার অন্ধকার থেকে জ্যোতির্ময়লোকে নিয়ে চল। মৃত্যুময় জগৎ থেকে অমৃতলোকে নিয়ে চল।'

এই ব্যাকুল প্রার্থনায়ই মনের অহং আঁধার চিন্ময় জ্যোতিসমুদ্রে মিশে গিয়ে আমি হয়ে যায় তুমি। তখনই সে মুক্ত আত্মায় বিধ্বনিত হয় নাহং নাহং তুহুঁ তুহুঁ। সেই দিব্যদৃষ্টিতেই এই ক্রন্দিতা ধরিত্রী হয় অখণ্ড আনন্দনির্ঝর।

॥ জয়তু বদ্রীবিশাল ॥

॥ **সমাপ্ত** ॥